KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : 28, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number ৫/- ৫/- ৫/-	Year of Publication পৌষ, ১৩৬৪ ফাল্গুন, ১৩৬৪ চৈত্র, ১৩৬৪
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

ARUNA MILLS
MARINA
more DURABLE
more STYLISH
SPECIALITIES
Sanforized :
Poplins
Shirtings
Check Shirtings
SAREES
DHOTIES
LONG CLOTH
Printed :
Voils
Lawns Etc.
in Exquisite Patterns
ARUNA
MILLS LTD.
AHMEDABAD
★ A R U N A ★
★ A R U N A ★

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ষষ্ঠ বর্ষ

পৌষ ॥ ১৩৬৫

= সম্পাদক =

= আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত =

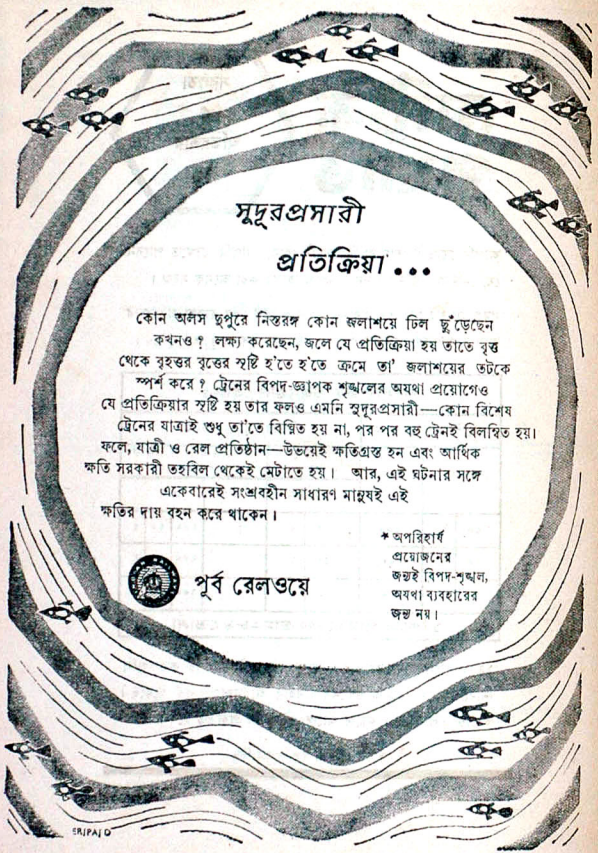

সমকালীন ॥ ৬ষ্ঠ বর্ষ। পৌষ ১৩৬৫

সূচীপত্র

প্রবন্ধ ॥ ডেভিড রিকার্ডো। মঞ্জুলা বসু ৫৩৭
অপ্রকাশিত পদাবলী। অন্নপূর্ণা ভাদুড়ী ৫৫১
ঠাকুরবাড়ীর ইতিকথা।অমৃতময় মুখোপাধ্যায় ৫৪৩
অনুস্মৃতি ॥ সাম্রিধ্য। চিন্তামণি কর ৫৬৯
উপন্যাস ॥ এক ছিল কন্যা। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৫৯
কবিতা ॥ নৃপুর। কৃষ্ণ দাশ ৫৬৮
সুনীল সমারোহ। সন্তোষ দাস ৫৬৭
আলোচনা ॥ অমল চক্রবর্তী ৫৭৪
সমাজ সমস্যা ॥ গোড়ায় গলদ। সুরেশ ঘোষ ৫৭৬
সমালোচনা ॥ নিরঞ্জন হালদার।
গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। প্রণবকুমার বর্দ্ধন

সম্পাদক
আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

ডেভিড রিকার্ডো

মঞ্জুলা বসু

সাধারণ মানুষের জীবনে তার দিনযাপনের চেষ্টার বাইরে ঘটনা বড় একটা ঘটে না। সংসারে সুখ আর সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করা, এর বেশী আকাঙ্ক্ষা তার জীবনে কী বা থাকে। তবু মাঝে মাঝে এই সাধারণ মানুষের জীবনই হঠাৎ অসাধারণত্বে মণ্ডিত হয়ে দেখা দেয়। তাকে বিশিষ্ট করে তোলে অন্য পাঁচজনের থেকে— যেমন ঘটেছিল ডেভিড রিকার্ডোর জীবনে। যা কিছু সংসারে কাম্য তার কোনটিরই অভাব তাঁর ছিল না। তাঁর পারিবারিক জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের ছিল; অন্যদিকে অতি অল্প বয়সেই ব্যবসায়ের দ্বারা প্রভূত সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন তিনি। অন্য যে কোন ধনী ব্যবসায়ীর মতই নিশ্চিন্ত বিলাসে জীবনযাপন করার পক্ষে তাঁর কোন বাধা ছিল না। কিন্তু তাঁর চিন্তাশীল মন ও জ্ঞানানুসন্ধিৎসা তাঁকে এসব নিয়ে তৃপ্ত থাকতে দিল না। ফলে তিনি তাঁর সমগোত্রীয় আর সকলের থেকে পৃথক হয়ে উঠলেন এবং অর্থনৈতিক চিন্তার জগতে যা দান করে গেলেন তার পরিমাণ সামান্য নয়।

অ্যাডাম স্মিথ বা কার্ল মার্কস-এর মত রিকার্ডোর নাম সাধারণের কাছে ঠিক ততটা সুপরিচিত নয়। কিন্তু স্মিথ বা মার্কস-এ'রা কেউই রিকার্ডোকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নন। ক্ল্যাসিকাল চিন্তাধারার জনক হিসাবে অর্থবিদ্যার জগতে স্মিথ-এর প্রতিষ্ঠা। আর রিকার্ডোর কথা বলতে আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে তাঁর খাজনার তত্ত্বের কথা— যে তত্ত্বের অসারতা আজকের দিনে আমাদের কাছে স্পষ্ট। কিন্তু কার্যতঃ স্মিথ যে অর্থশাস্ত্রের জন্ম দিয়েছিলেন রিকার্ডোকে বাদ দিয়ে তা পূর্ণাঙ্গ হতে পারতো না, ক্ল্যাসিকাল মূলসূত্রগুলি রিকার্ডোর মধ্যে দিয়েই পরিস্ফুট হয়েছিল। অপরদিকে রিকার্ডোর অর্থনৈতিক চিন্তার মধ্যে মার্কসীয় বিপ্লবের অঙ্কুর খুঁজে পাওয়া যায়। তাই ক্ল্যাসিকাল, নিও ক্ল্যাসিকাল ও মার্কসবাদী সব অর্থনীতিবিদরাই রিকার্ডোর কাছে ঋণী। মনে প্রাণে রিকার্ডো স্মিথ এর শিষ্য হলেও তাঁর লেখা নিয়ে যত তর্কবিতর্কের অবতারণা এ পর্যন্ত হয়েছে তেমন স্মিথ এর নিজের লেখা নিয়ে হয়নি।

বিস্ময়ের কথা এই যে অ্যাডামস্মিথ-এর মত রিকার্ডো উচ্চশিক্ষা পাননি। প্রৌঢ়বয়স পর্যন্ত পাউন্ড শিলং-এর হিসেব কষেই তাঁর দিন কেটেছে। সে পরিবেশ বিদ্যাভ্যাসের পক্ষে অনুকূল ছিল না। তা সত্ত্বেও যে গভীর চিন্তাশীলতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আমরা

তাঁর মধ্যে পাই তা সত্যিই দুর্লভ। এমন কি স্মিথ-এর মধ্যেও অনুরূপ বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অভাব ছিল।

রিকার্ডোর জন্ম হয় ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের হল্যাণ্ডের ইহুদী পরিবারে। তাঁর পিতা পরিবারের সবাইকে নিয়ে চলে আসেন ইংল্যাণ্ডে ও স্টক মার্কেটে দালালী শুরু করেন। চৌদ্দ বছর বয়সেই রিকার্ডো পিতার ব্যবসায়ে যোগদান করলেন। ব্যবসায়ে রিকার্ডো যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর অর্জিত সম্পত্তির মূল্য প্রায় কুড়ি হাজার পাউণ্ড। তখনকার দিনে তো বটেই, আজকের দিনের মাপকাঠিতেও এটি একটি বিরাট অঙ্ক।

এমনি করে জীবনের অনেকটাই রিকার্ডোর কেটেছে অর্থসংগ্রহের চেষ্টায়। বাইরে থেকে দেখতে অতি সাধারণ ঘটনাবিহীন একটি জীবন। তবু এরই মধ্যে তাঁর স্বাধীন চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যখন একুশ বছর বয়সে পরিবারের অন্য সকলের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তিনি ধর্মান্তর গ্রহণ করে খৃষ্টান হলেন। এর অব্যবহিত পরেই তিনি মিস উইলকিনসন নাম্নী এক মহিলাকে বিয়ে করেন। রিকার্ডোর বিবাহিত জীবন অত্যন্ত সুখেই কেটেছে। স্বামী ও পিতা হিসাবে তিনি ছিলেন আদর্শ। কিন্তু ধর্মান্তর গ্রহণের জন্য পিতার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়ে গেল। এর পর সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছে। রিকার্ডোর বয়স তখন খুব অল্প হলেও তাঁর বাক্তিত্বের প্রভাব অনেককেই আকর্ষণ করতো। তাই তাঁর গুণমুগ্ধ বহু প্রবীণ ব্যবসায়ীর কাছে তিনি এসময় যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন। ত্রিশ বছর পূর্ণ হবার আগেই যে সম্পত্তি তিনি অর্জন করেছিলেন সারা জীবন বিনা আয়াসে কাটিয়ে দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট।

আটত্রিশ বছর পর্যন্ত রিকার্ডো একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী রূপেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন। অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো তখনও আত্মপ্রকাশ করেন নি। তবে তদানীন্তন ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো নিয়ে তিনি যে মোটেই মাথা ঘামাননি তা নয়। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে ইংল্যাণ্ডের অবস্থা যে ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল তা যে কোন লোককেই ভাবিয়ে তুলতে পারতো। জিনিষ পত্রের দাম দিনদিনই বাড়ছিল ও কাগজীমুদ্রার মূল্যের দ্রুত পতন ঘটছিল। জাতীয় ঋণের পরিমাণ প্রায় অপরিশোধনীয় হয়ে উঠেছিল। এদিকে ইংল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা প্রবলবেগে বেড়ে চলেছে অথচ শস্যের উৎপাদন পরিমিত থাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। সেদিনকার দুর্দশার কথা আজকের দিনে বুটেনের অধিবাসীদের কল্পনারও বাইরে। কাগজী মুদ্রার মূল্যহ্রাস ব্যবসায়ী রিকার্ডোকে আঘাত করে তাঁর চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করে তুললো। স্টক এক্সচেঞ্জে দালালী করবার সময় প্রথমটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণেই রিকার্ডো ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ও বিনিময়প্রথার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এর ফলাফল যে কতটা সুদূরপ্রসারী হবে তা রিকার্ডো নিজেও কল্পনা করতে পারেননি। এই চিন্তা কতদূর ফলপ্রসূ হতো বলা যায় না যদি না আকস্মিকভাবে একটি ঘটনা এই সময়েই ঘটতো। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রিকার্ডো হঠাৎ অ্যাডাম স্মিথের "Wealth of Nations" বইখানি পড়লেন। এরপর থেকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে তিনি আরও গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। অবশ্য এই ঘটনাটা হয়তো নেহাৎই উপলক্ষ্য মাত্র। এর পেছনে নিশ্চয়ই কাজ করেছিল তাঁর চিন্তাশীল মন ও ইহুদী জাতিসুলভ বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা। তাই তাঁর সব লেখার মধ্যে স্মিথের মত প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য বা রচনাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় না কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও গভীর যুক্তিশীলতার প্রকাশ আছে। "Wealth of Nations" তাঁর চিন্তাকে সচেতন করে তোলার পর থেকে তিনি দশ বছরেরও বেশী ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে পড়াশুনা করতে থাকেন এ বিষয়ে। তাঁর প্রথম সৃষ্টি হলো ১৮১০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "The High Price of Bullion—a proof of theDepreciation

of Bank notes"নামক নিবন্ধটি। তখন রিকার্ডোর বয়স আটত্রিশ বছর। এর পরে আর তেরো বছর তিনি জীবিত ছিলেন। খুব বেশীদিন সময় তিনি পাননি। প্রাথমিক জীবনেও চিন্তাশক্তির অনুশীলনের সুযোগ থেকে রিকার্ডো বঞ্চিত ছিলেন। শিক্ষার অভাবে তাঁর লেখার মধ্যে প্রকাশভঙ্গীর দৈন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তিনি যা সৃষ্টি করে গেছেন তার ফলে তিনি তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ বলে তো প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেনই উপরন্তু অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ পথিকৃৎ হিসাবে স্মরণীয় হয়ে রইলেন। "High Price of Bullion" প্রকাশিত হবার পর থেকে রিকার্ডো অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের মূলসূত্রগুলি নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন। এই চিন্তারই পরিণত ফল হচ্ছে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "The Principles of Political Economy and Taxation." Principles প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। এ ছাড়াও তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যে দিয়ে তাঁর বক্তব্য তিনি প্রকাশ করেছেন। জেমস মিল, বেন থাম, ম্যালথাস প্রমুখ তদানীন্তন বহু খ্যাতনামা লোকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এঁদের সঙ্গে তাঁর যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয় তার পরিমাণও কম নয়।

এই সময় রিকার্ডো তাঁর ব্যবসা গুটিয়ে ফেলেছেন। অর্থচিন্তা করবার তাঁর আর কোন প্রয়োজন ছিল না। কিছু জমি কিনে তিনি জমিদার হয়ে বসলেন এবং তারই জোরে পার্লামেন্টে একটি আসন দখল করলেন। বক্তা হিসাবে কিন্তু তিনি একেবারেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে তিনি মাত্র দুবার পার্লামেন্টের অধিবেশনে বক্তৃতা দেবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু সে অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে। নিজের কণ্ঠস্বর কানে আসামাত্রই একটা প্রবল ভীতি তাঁকে পেয়ে বসতো যা তিনি কোনমতেই কাটিয়ে উঠতে পারতেন না। একবার তো এমন ঘটলো যে তিনি কিছুতেই বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়াচ্ছেন না। তখন পার্লামেন্টের সব সদস্যরা সমস্বরে তাঁকে ডাকাডাকি আরম্ভ করে দিলেন, অবশেষে তিনি ঘোরতর অনিচ্ছা সহকারে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সুবক্তা না হলেও তাঁর প্রতিভার জন্য তিনি পার্লামেন্টে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এসেছেন এবং তাঁর সময়কার শাসনব্যবস্থার উপর সুস্পষ্ট ছাপ রেখে গেছেন। রিকার্ডো অবাধ বাণিজ্যে বিশ্বাসী ছিলেন ও কুখ্যাত corn-law গুলিকে বাতিল করার পেছনে তাঁর প্রেরণা কাজ করেছে। তখন বুটেনে প্রচুর খাদ্যাভাব থাকা সত্ত্বেও জমিদার শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য শস্যের অবাধ আমদানী বন্ধ রাখা হয়েছিল। রিকার্ডো প্রমুখ আরও কিছু উদারপন্থী লোকের চেষ্টায় corn-law বাতিল হলো। অথচ রিকার্ডো নিজেই ছিলেন জমির মালিক। সরকারীদলের সদস্য হয়েও তিনি যেখানে প্রয়োজন মনে করেছেন নির্ভয়ে সরকারবিরোধী মতামত প্রকাশ করেছেন। প্রায় আগা গোড়াই তিনি সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে গেছেন। পার্লামেন্টের সংস্কার, ব্যালট প্রথার প্রবর্তন, "poor-law" প্রণয়ন, বৃদ্ধবয়সে পেনশন দেবার ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রত্যেকটি প্রগতিশীল ও সমাজকল্যাণমূলক প্রস্তাবের পিছনে তাঁর সক্রিয় সমর্থন ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একজন বিত্তশালী ভূমাধিকারীর পক্ষে এ কম ঔদার্য্যের পরিচায়ক নয়।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রিকার্ডো পার্লামেন্ট থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত প্রায়। এরপরে তিনি আর মাসকয়েক মাত্র জীবিত ছিলেন। শেষের কটি মাস তাঁর শারীরিক যন্ত্রণা ও আচ্ছন্নভাবের মধ্যে দিয়ে কেটেছে। ঐ বছরই সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর

মৃত্যু হয়। ব্যক্তিগত জীবনে রিকার্ডো ছিলেন দয়ালু, উদার মতাবলম্বী, নম্র ও ইংরেজীতে যাকে বলে "unassuming", তাই।

রিকার্ডোর অর্থনৈতিক চিন্তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবু তাঁর মূল বক্তব্যগুলি নিয়ে দু একটি কথা বলা যেতে পারে। কোনও বিশেষ মতবাদের স্রষ্টা হিসেবে রিকার্ডোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। স্মিথ-এর পর থেকে যে বিভিন্ন খাতে অর্থনৈতিক চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়েছে তার পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে গেছেন রিকার্ডো। তাঁর চিন্তার প্রেরণা জুগিয়েছিলেন অ্যাডাম স্মিথ। কিন্তু রিকার্ডোকে বাদ দিয়ে স্মিথ অসম্পূর্ণ। আবার ক্ল্যাসিকাল চিন্তাধারার অনেক অসঙ্গতি প্রথম ধরা পড়েছে রিকার্ডোর চোখে। স্মিথ নির্দেশিত পথের বাইরে যাওয়া রিকার্ডোর পক্ষে সম্ভব হয়নি বলে এই অসঙ্গতিগুলোর সঠিক উত্তর তিনি খুঁজে পাননি। কিন্তু এদের সম্বন্ধে যে সচেতন ছিলেন সেকথা ভুললে চলবে না। এই অসঙ্গতিগুলো থেকেই পরে মার্কসীয় অর্থনীতির জন্ম। রিকার্ডো যেখানে থেমেছেন মার্কস সেইখান থেকে চিন্তার সূত্র ধরে এগিয়েছেন।

রিকার্ডোর আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল বন্টনব্যবস্থা ও মূল্যনিরূপণতত্ত্ব। এ ছাড়া অর্থ, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ইত্যাদি নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। রিকার্ডোর আগে পর্যন্ত অর্থনীতিকদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল উৎপাদন ব্যবস্থা। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে উৎপাদন বাড়লে আপনিই দেশের প্রত্যেকটি লোকের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে। কিন্তু রিকার্ডো বন্টনব্যবস্থার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বন্টনব্যবস্থার আলোচনার মধ্যে দিয়েই ধনতান্ত্রিক সমাজের বহু অসামঞ্জস্য তাঁর চোখে প্রথম ধরা পড়েছে। পরবর্তীকালের সোসালিস্ট চিন্তার উপর এর প্রভাব কম নয়।

মার্কস-এর সঙ্গে রিকার্ডোর সম্বন্ধটা বুঝতে হলে তাঁর মূল্য নিরূপণের তত্ত্বটা একটু আলোচনা করা দরকার। স্মিথ, রিকার্ডো এবং মার্কস এঁরা সকলেই ধরে নিয়েছেন যে দ্রব্য-উৎপাদনের জন্য যে কায়িক শ্রমের প্রয়োজন হয় তাই হলো দ্রব্যের মূল্যের উৎস। স্মিথ বলেছেন যে দ্রব্যের পেছনে নিয়োজিত শ্রমই হচ্ছে তার মূল্যের পরিমাপ। কিন্তু আধুনিক জগতে শ্রম ছাড়াও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি প্রয়োজন হয় উৎপাদনের জন্য, সুতরাং কেবলমাত্র শ্রমের দ্বারা মূল্য নিরূপিত হবে কেন। একথার উত্তরে স্মিথ বলেছেন যে আদিম যুগে যখন মূলধন আবিষ্কৃত হয়নি তখনই তাঁর মূল্যতত্ত্ব প্রযোজ্য। এই সংকীর্ণতা থেকে Labour Theory of value-কে উদ্ধার করেছেন রিকার্ডো। তিনি বলেছেন যে মূলধনের মধ্যে পূর্বের সঞ্চিত শ্রম রয়েছে এবং দ্রব্যের মূল্য কেবলমাত্র শ্রমের উপর নির্ভরশীল, তা বর্তমানেরই হোক অথবা মূলধন উৎপাদনে নিয়োজিত পূর্বের শ্রমই হোক। সুতরাং, পুঁজি বা মূলধনের মালিক যেই হোক না কেন, মূল্য শ্রমিকেরই প্রাপ্য। শ্রমিক নিজে যদি মূলধনের মালিক হয়, দ্রব্যের মূল্য শুধু সেই পাবে। আর যদি এই মূলধনের মালিক অন্য কেউ হয় তবে মূল্য দুটি ভাগে বিভক্ত হবে—একটি পাবে শ্রমিক এবং অন্যটি পাবে পুঁজিপতি (ক্যাপিটেলিস্ট) —কিন্তু সে শুধু পূর্বের সঞ্চিত শ্রমের মূল্য হিসাবে।

এইভাবেও কিন্তু মূল্যনিরূপণ সমস্যার সমাধান করা যায়নি। নিয়োজিত শ্রমের দ্বারা যে মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত দ্রব্যের বিনিময় মূল্য তার চেয়ে বেশীই হয়ে থাকে। এই উদ্বৃত্ত হচ্ছে পুঁজিপতির লাভ এই সত্য রিকার্ডো নিজেই উপলব্ধি করেছেন তবু সমস্যাটির কোন সঠিক সমাধান তিনি দিতে পারেন নি। তিনি বলেছেন এর জন্য Labour Theory-র সত্যতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় না কারণ দ্রব্যের স্বাভাবিক মূল্য হচ্ছে নিয়োজিত শ্রমের পরিমাণের

সমান। বাজারদর সাময়িকভাবে যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিকমূল্যেরই সমান হবে। এইভাবে মূল্যনিরূপণের উপর শ্রম ছাড়াও যোগান ও চাহিদার প্রভাব পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আবার আর এক জায়গায় মূল্যের উপর উৎপাদন খরচ এর প্রভাবকেও পরোক্ষভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। এই জটিলতার অবসান রিকার্ডোর দ্বারা সম্ভব হয়নি। পরে Labour Theory of value-র অন্তর্নিহিত এই অসঙ্গতি উপলব্ধি করেছেন মার্কস এবং এর থেকেই তাঁর Surplus value ও Exploitation-এর মতবাদের জন্ম। রিকার্ডো নিজে সত্যের কাছাকাছি এসেও তার নাগাল পাননি কারণ তিনি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করেন নি। উৎপাদন ব্যবস্থার সামাজিক কাঠামো অর্থাৎ মূলধনের মালিকানা তাঁর আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাই সমাজের বন্টনব্যবস্থা যে মূলধনের মালিকানার দ্বারা প্রভাবিত হবে একথা রিকার্ডোর ধারণার বাইরে ছিল।

রিকার্ডোর এই ব্যর্থতার কারণ হচ্ছে যে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অধিকারী হলেও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ছিল তাঁর। তাই তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক অর্থনীতিবিদদের মত শ্রমকে একটি পণ্যদ্রব্য রূপেই দেখেছেন। মানুষ হিসাবে শ্রমিকের সমস্যাগুলোর দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিলনা। উৎপাদন ব্যবস্থার সামাজিক কাঠামোর দরুণ শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে যে ধন বৈষম্য দেখা দেয় সেটা তাঁর চিন্তার বিষয় ছিল না। বরং রিকার্ডো নির্বিকারচিত্তে এই কথাই বলেছেন যে শ্রমিকের মজুরী তার গ্রাসাচ্ছাদনের মূল্যের চেয়ে বেশী কিছুতেই হবে না। যদি তার বেশী হয় তবে শ্রমিকদের বংশ বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। ফলে শ্রমের যোগান বাড়বে ও মজুরীর হার আবার কমে আসবে। ম্যালথুসীয় জনসংখ্যার তত্ত্বের দ্বারা রিকার্ডো খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত হয়েছিলেন কারণ এর অল্প কিছুদিন আগেই ম্যালথাসের মতবাদ ইংল্যান্ডে একটি গভীর সাড়া এনে দিয়েছিল। মজুরীর হারের স্বল্পতাকে রিকার্ডো সমর্থন করেছেন জনসংখ্যা বৃদ্ধির দোহাই দিয়ে। পরে মার্কস তাঁর Reserve Army of Labour ও শোষণের ধারণা দিয়ে একে ব্যাখ্যা করেছেন। রিকার্ডো সে পথে যাননি। ধনতান্ত্রিক সমাজে যে শ্রমিকের শোষণ ও তার জন্য সামাজিক বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হতে পারে এ সম্ভাবনাটি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল।

তবুও শ্রেণীগত স্বার্থের বিরোধ যে সমাজে কোনও না কোন ভাবে দেখা দিতে পারে একথা রিকার্ডো বিশ্বাস করতেন। সেদিক থেকে শ্রেণী সংঘর্ষের ধারণার অগ্রদূত বলা চলে রিকার্ডোকে। তাঁর খাজনার তত্ত্ব এই কথাই প্রমাণিত করে যে জমির মালিকের স্বার্থ সমাজের অন্য সকল স্বার্থের বিরোধী। কারণ খাজনা হচ্ছে উৎপন্ন ফসলের মূল্য থেকে উৎপাদন খরচ বাদ দিলে যা উদ্বৃত্ত থাকে তাই। এই উদ্বৃত্তটুকু জমির মালিকের পাওনা, তার পরিশ্রমের ফলস্বরূপ নয়, শুধুই জমির মালিক বলে জমির উৎকর্ষের জন্য বিনা আয়াসে সে এটি পেয়ে থাকে। অনায়াসলব্ধ উদ্বৃত্তবলেই এটি একটি সমাজবিরোধী আয়। ব্যক্তিগত মালিকানা এর উপর ভবিষ্যতে মার্কসীয় অর্থনীতিবিদদের যে অসন্তোষ তার উৎস রিকার্ডোতেই। দ্বিতীয়তঃ রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে ফসলের মূল্য যত বেশী হবে জমির মালিকের লাভও তত বেশী হবে। কিন্তু ফসলের মূল্য বেশী হলে শ্রমিকের ক্ষতি, পুঁজিপতিরও ক্ষতি কারণ শ্রমিককে তখন তার বেশী মজুরী দিতে হবে। বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনাকে এইভাবে স্বীকার করে নেওয়াতে ভবিষ্যতে শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনাকে মেনে নেওয়ার পথ সুগম হয়েছে। স্মিথ প্রমুখ ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদরা প্রাকৃতিক বিধান ও স্বাভাবিক সামঞ্জস্যের একটি কল্পনারাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। স্মিথ বলেছেন, কোন অমোঘ অদৃশ্য-

শক্তির বিধানে সমাজের প্রত্যেকটি লোক নিজের মঙ্গল সাধন করতে গিয়ে সমাজের মঙ্গল করছে। কিন্তু রিকার্ডো এই স্বাভাবিক সামঞ্জস্যের ধারণাকে ভেঙ্গে দিয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃত রূপটি উদ্‌ঘাটন করেছেন। এইভাবে তাঁর কালের চিন্তাধারাকে অতিক্রম করে তিনি বহুদূর এগিয়েছেন।

আরও একটি দিক থেকে রিকার্ডোকে একেবারে আধুনিক বলা উচিত। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতি অনুসারে স্বাভাবিক নিয়মেই সমাজে পূর্ণ কর্মসংস্থান হবে। কারণ উৎপাদন বাড়লেই সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা বাড়বে ফলে কোন জিনিষ অবিক্রীত থাকবে না। সুতরাং পূর্ণ কর্মসংস্থান যতক্ষণ না হচ্ছে উৎপাদন বাড়িয়ে যাওয়া চলে। এই ধারণাটি বহুদিন পর্যন্ত অর্থশাস্ত্রের জগতে একাধিপত্য করে এসেছে। কিন্তু রিকার্ডো বিশ্বাস করেননি যে স্বাভাবিক নিয়মে পূর্ণ কর্মসংস্থান হতে পারে। "প্রিন্সিপাল্‌স"-এর তৃতীয় সংস্করণ "অন মেসিনারি" শীর্ষক একটি অধ্যায় সংযোজন করা হয়। তাতে রিকার্ডো দেখিয়েছেন যে সমাজে মূলধনের পরিমাণ যত বাড়ে শ্রমের চাহিদা ঠিক তার সমানুপাতিক হারে বাড়ে না কারণ যন্ত্রের ব্যবহার ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। ফলে শ্রমিকের অবস্থার অবনতি ঘটে। তিনি বলছেন— "মেসিনারি এণ্ড লেবার আর ইন কন্‌সটেণ্ট কম্পিটিশন্‌।" সোস্যালিস্ট লেখকরা যে ওভার একিউমিলেসন ও আণ্ডার কন্‌জামশান্‌-এর সমস্যা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন তার সূত্রপাত রিকার্ডোতে।

তাঁর সমসাময়িক সব অর্থনীতিবিদদের মধ্যে রিকার্ডো অবিসংবাদিতভাবে শীর্ষস্থানীয় বলে সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছেন। কিন্তু রিকার্ডো সম্বন্ধে এইটেই সবচেয়ে বড় কথা নয়। তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে যে তাঁর কালের গণ্ডীকে অতিক্রম করে তিনি ভবিষ্যতের জন্য পথ সৃষ্টি করে দিয়ে গেছেন। বিশেষ কোন মতবাদ তিনি সৃষ্টি করে যেতে পারেন নি— সে অবশ্য অ্যাডাম স্মিথও করেন নি। কিন্তু তাঁর চিন্তার ধারা শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে নানাদিকে উত্তরকালের চিন্তাকে পরিচালিত করেছে। অ্যাডাম স্মিথ ও ম্যালথাসের খ্যাতি সাধারণের কাছে রিকার্ডোর নামকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতায় রিকার্ডোর স্থান এঁদের চেয়ে অনেক উপরে।

ঠাকুরবাড়ীর ইতিকথা

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

ছেলেবেলা থেকে দেখছি দোতলার বৈঠকখানা ঘরের দেওয়ালে দ্বারকানাথের একটা মস্ত ছবি। এতবার দেখেছি যে এখনও যে কোন সময় চোখ বুজলেই দেখতে পাই— মাঝারি মাপের লোক। মাথায় বাবরি চুলের উপর সামলার মত বাঙ্গালী পাগড়ি। পরণে মখমলের উপর কাজ করা জোব্বা আর কাশ্মীরি জামেয়ার তার উপর। হাতের আঙ্গুলগুলো মেয়েদের মত সরু সরু, পাকানো গোঁফ জোড়ার সঙ্গে কেমন যেন বেমানান। পাশে পাথরের টেবিলের উপর সূক্ষ্ম কাজ করা এক আলবোলা, তারই একটা অংশে দোয়াত কলম দান। টেবিলের পাশে তলায় বইয়ের গাঁদা।

নানা লোকের কাছে নানা গল্প শুনি এই দ্বারকানাথের। কোথায় লক্ষ টাকা দান করেছেন, কেমন কল্পনাতীত আড়ম্বরে ভোজ দিলেন লাট বেলাটদের। ঐসব আশ্চর্য্য গল্পের মধ্যে দিয়ে তিনি আমাদের কাছে হয়ে গিয়েছিলেন রূপকথার মানুষ। আসল লোকটী কেমন ছিলেন, কেমন করে তিনি এত টাকা করলেন আর খরচ করলেন এ সব খবর প্রায় কেউই দিতে পারত না। কারুর কাছে তিনি ছিলেন মহাদানবীর, কারুর কাছে পরম বিলাসী, কারুর কল্পনায় চরম ব্যবসায়ী। একটা বিষয়েই শুধু তারা একমত হত—সেটা হল যে দ্বারকানাথ ছিলেন পুরোপুরি অসাধারণ। ঐযে আগেই বলেছি— রূপকথার মানুষ— সেই অলীক আবছায়া ভাবটা দেখেছি তাঁর সম্বন্ধে সকলের কল্পনা ঘিরে আছে। ব্যতিক্রম ছিলেন দুজন।

একজন হলেন অবনীন্দ্রনাথ। তখনো খবরের কাগজের খরখরে কল্পনার ধাক্কায় তিনি "অবু দাদু"-তে পরিণত হন নি, আমাদের তিনি ছিলেন অবন দাদামশাই। তাঁর কাছে অনেক ছোট খাটো ঘটনার গল্প শুনেছি দ্বারকানাথের। তাঁর বলবার কায়দায় মানুষ দ্বারকানাথকে কতকটা পরিস্কার ভাবেই দেখতে পেতাম। অন্যজন ছিলেন আমার দাদামশাই ক্ষিতীন্দ্রনাথ। দ্বারকানাথ সংক্রান্ত চিঠি, বই ছবি সব কত জায়গা থেকে তিনি জড় করতেন জীবনী লিখবেন বলে; কিন্তু সে সব জিনিষে হাত দেবার অধিকার তখন ছিল না।

আরেকটু যখন বড় হলাম, তখন অনেক সাধ্যসাধনা করে আর খুব যত্ন করবার কথা নিয়ে দাদামশাইয়ের আলমারী থেকে একটা বই পেলাম পড়তে— লাল চামড়ার বাঁধাইয়ের উপর সোনার হরফে লেখা মেমোরি অব দ্বারকানাথ টেগর কিন্তু কিশোরীচাঁদ মিত্রের লেখা ঐ বইটার আরম্ভেই ভাষা এত খটমট যে তখনকার বিদ্যের দৌড়ে কয়েকপাতার বেশী এগুতে পারি নি। সেই যেখানটায় তিনি বলেছেন যে ঠাকুরবাড়ীর গোড়া বলতে গেলে যে লোকটাকে প্রথম পরিস্কার ভাবে দেখতে পাই সে হল পঞ্চরামের ছেলে জয়রাম। তিনিই প্রথম সুতানটীতে বাড়ী তুলে কলিকাতার পাকা দলিলে দস্তখৎ করেন।

পঞ্চরাম নামটা ভারী মজার ঠেকেছিল। লোকে কথায় বলে "একা রামে রক্ষে নেই"— এ ত' একেবারে পাঁচটী রাম। লোকটার আকৃতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে বেশ একটা সাংঘাতিক কল্পনা মনে গড়েছিলাম। পরে জেনে মন খারাপই হল যে ওটা বোধহয় ছাপার ভুল—তাঁর আসল নাম ছিল পঞ্চানন।

দ্বারকানাথ জন্মাবার প্রায় ১০০ বছর আগে যখন ইংরাজেরা হুগলী ছেড়ে সুতানটীতে কুঠি বাঁধলেন সেই সময়েই কাছাকাছি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশে পঞ্চানন এসে বাধা বাঁধলেন

গোবিন্দপুরে আদিগঙ্গার ধারে। তখনও টলি সাহেব এসে ওটাকে টলির নালা বানান নি— লোকে ওটাকে বলত গোবিন্দপুরের খাঁড়ী।

পঞ্চানন যেখানে রইলেন, সেখানে জেলে কৈবর্ত্তদের বাসই বেশী, কিছু ব্যবসাদার "পোদ"ও ছিল। তারা খুব অগ্রহযত্ন করে পঞ্চাননের থাকার পাকা ব্যবস্থা করলেন। "এতগুলি নীচ জাতির মধ্যে পঞ্চাননই একা একঘর ব্রাহ্মণ গিয়া বাস করায়, পঞ্চাননের নাম ও উপাধি ক্রমশঃ ডুবিয়া গেল। ক্রমে তিনি নীচ- জাতিসুলভ ব্রাহ্মণের সাধারণ "ঠাকুরমশাই" নামেই প্রসিদ্ধ হইলেন। ক্রমশঃ এমন হইল, তাঁহার পরিচিত ব্যক্তি মাত্রই তাঁহাকে "ঠাকুর মশাই" বলতে আরম্ভ করিলেন। শেষে সকলেই তাঁহার কথা বলিবার সময় "পঞ্চানন ঠাকুর" এইরূপ নামেই উল্লেখ করিত।"

তখন আদি গঙ্গার মুখে বিদেশী জাহাজ সব এসে নোঙর করত— সেকালের কাঠের জাহাজ পাল তুলে হাওয়ার উপর ভরসা করে অনেকদিন অনিশ্চিতভাবে সমুদ্রে কাটাবার পর এই প্রথম জনবহুল ডাঙ্গা দেখতো। জল, রসদ থেকে আরম্ভ করে জাহাজের জীবনে দৈনন্দিন যা কিছু দরকার সব প্রায় ফুরিয়ে আসত এখানে পৌঁছাবার আগেই। সব কিছুই আবার নতুন করে বোঝাই করে নিতে হত। পঞ্চানন ঠাকুর ও তাঁর এক আত্মীয় এই সব সরবরাহের ব্যবসা আরম্ভ করলেন। গোড়ায় দিতেন শুধু ফলমূলাদি, তারপর সব জিনিষই চালান দেন এবং প্রচুর রোজকারও হত। তাঁর দেখাদেখি অনেকেই এ ব্যবসায় নামেন। সকলেই মনে করত এবং চেষ্টাও করত যাতে একটা কাপ্তেন ধরে দারিদ্র্য ঘুচিয়ে নেওয়া যায়। এদেশে নতুন আসা জাহাজের ক্যাপ্টেন ও নাবিকরা দরদাম কিছু জানতো না— তারই সুযোগ নেবার চেষ্টা করত এরা। এই থেকেই বাংলাভাষায় "কাপ্তানি করা" ও "কাপ্তেন পাকড়ান" কথা দুটির উৎপত্তি। যাই হোক ততদিনে পঞ্চানন ঠাকুরের সঙ্গে অনেক বিদেশী ক্যাপ্টেনের জানাশোনা হয়ে গেছে বলে ব্যবসায়ের বিশেষ অসুবিধা বোধ হয় নি।

ক্রমে গোবিন্দপুরে গঙ্গাতীরে পঞ্চানন ঠাকুরের বাড়ী ও একটী শিবালয় তৈরী হল। ইংরেজরা যখন কুঠিকে কেল্লা বানান তখনও ইনি দুর্গের সব জিনিষ সরবরাহ করতেন। গোবিন্দপুরের জেলেরা যে "ঠাকুর" নামে ডাকত, সেই "ঠাকুর" নামেই ইংরেজদের কাছেও পরিচিত ছিলেন। অর্ডার দেওয়া, বিল করা সবই ঐ "ঠাকুর" নামেই হত।

পঞ্চানন ঠাকুরের ছেলে জয়রাম, ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা খাতিরে যাতায়াত থাকায় কিছুটা ইংরাজী শেখেন। ইংরেজ মুরুব্বিদের ধরে পঞ্চানন ছেলেকে ইংরেজ কুঠিতে একটা চাকরী করে দেন— "পে মাস্টার" আফিসের "হেড সরকার"।

১৭০৭ খৃঃ কলিকাতার প্রথম কলেক্টর পদে বহাল হয়ে Ralf Sheldon সাহেব ঐ কলিকাতা অঞ্চল প্রথম জরীপ করতে আরম্ভ করলেন। জরীপের কাজ শিখিয়ে জয়রামকে তিনি আমীন করে এই কাজের ভার দেন। এর পুরস্কারে স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে "উত্তর কালে নবকৃষ্ণ মুন্সী (পরে মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব) ইংরাজ কোম্পানীতে সুতানটী পরগণার জন্য বার্ষিক যে টাকা খাজনা দিতেন, তাহা আমীন জয়রাম ঠাকুরেরই নির্দ্ধারিত খাজনাই।"

জয়রাম উপার্জ্জন ভালই করেছিলেন। ধনসায়র (ধর্ম্মতলা) এলাকায় বাড়ী, বৈঠকখানা, জমিজমা ও এখন যেখানে ফোর্ট উইলিয়াম কেল্লা এখানে বাগানবাড়ী করেন। ১৮১৩ খৃঃ জয়রামের এক প্রপৌত্র রাধাবল্লভ ঠাকুর তাঁর জাতিদের সঙ্গে যে সম্পত্তি নিয়ে মামলা করেন তার নালিসী আরজিতে দেখি "Joyram's house was at Dhanno sayes, now called Dhurrumtollah and had a garden house where Fort William is now built and a Baitk-khana near his house and lands at Dhurrumtollah".

পলাসীর যুদ্ধের ঠিক আগে যখন সিরাজদ্দৌলার সৈন্য কলকাতা আক্রমণ করে তখন তারা জয়রামের পৈত্রিক ভিটা ও মন্দিরটাকে বাঁচিয়ে চলেছিল বটে কিন্তু পুনরধিকারের সময় ইংরেজরা ছেড়ে কথা কয়নি। এই অবরোধের সময় নিরাপদে পালাতে পারার জন্য জয়রামের স্ত্রী গঙ্গা দেবী মানত করেছিলেন যে তাঁর গায়ের গয়না সব দেবতাকে দেবেন। সেই অনুসারে পলাশীর যুদ্ধের পর তিনি রীতিমত লেখাপড়া করে ১৩০০৲ টাকার গয়না গৃহদেবতার নামে উৎসর্গ করেন।

ইংরেজের গোলায় ঘরবাড়ী ত' গেলই, তারপর কোম্পানী ধর্ম্মতলার জায়গাটুকুও নিয়ে নিল— বড় করে দুর্গ ও গড়ের মাঠ তৈরীর জন্য দরকার বলে। তখন বাধ্য হয়ে সরে এসে পাথুরিয়া ঘাটায় গঙ্গার তীরে জয়রাম বসতবাটী স্থাপন করলেন।

জয়রামের জমি কেড়ে নেওয়ার জন্য ইংরেজ কোন ক্ষতিপূরণ দেয় নি। অন্ততঃ যারা ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল তাদের তালিকায় জয়রামের নাম নেই। যুদ্ধের দরুন যাদের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে যায় তাদের ক্ষতিপূরণের তালিকাতেও নাম নেই। যতদূর জানা যায় মোটা টাকা কিছু তিনি পান নি, তবে নতুন করে দুর্গ তৈরীর সময় একটা ঠিকাদারী তাঁকে দেওয়া হয়। সিরাজদ্দৌলার আক্রমণে পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ যে লোপ পেয়েছিল তা মোটেই নয়; তবু ঐ দুর্গকে নতুন করে বড় করে গোছাতে বহুদিন ধরে বহুটাকা নষ্ট করা হয়।

এই ঠিকাদারী করে জয়রাম বেশ সংগতিপন্ন হয়েছিলেন বলেই ধারণা হয়। মৃত্যুকালে তিনি গৃহদেবতার সেবার জন্য তের হাজার সিক্কা টাকা ছেলেদের হাতে দিয়ে যান।

জয়রামের চার ছেলের মধ্যে বড় আনন্দীরাম হলেন বোধহয় প্রথম বাঙ্গালী যিনি ইংরাজী ভাষা বেশ ভালরকম শিখেছিলেন, আর ছোট গোবিন্দরাম জয়রামের মৃত্যুর পর ফোর্ট উইলিয়মের ঠিকাদারী কাজটার হেফাজৎ করতে থাকেন। এঁদের সরাসরি বংশধর এখন কেউ জানা নেই।

জয়রামের মেজ ছেলে নীলমণি ও সেজ দর্পনারায়ণ দুটী বিখ্যাত বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পায়। ঐ বৎসরই জয়রামের মেজ ছেলে নীলমণি কোম্পানির আমলা হয়ে চট্টগ্রামে যান। ক্রমশঃ উন্নতি করে তিনি সেখানে জেলা আদালতের সেরেস্তাদার পর্যন্ত হয়েছিলেন। সেই সময়ে এদেশীয় লোকের পক্ষে সেরেস্তাদারী ছিল সরকারী চাকুরীতে উন্নতির চরম। সেখান থেকে যেমন যেমন সুবিধা পেয়েছেন নীলমণি রোজকারের টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন কলিকাতায় মেজ ভাই দর্পনারায়ণের কাছে। দর্পনারায়ণ তেজারতি কারবার ও অন্যান্য নানা উপায়ে সেটাকে অনেক বাড়িয়েছিলেন। দর্পনারায়ণদের এই তেজারতি কারবারে একজন বড় অংশীদার ছিলেন বারাণসী ঘোষ —যাঁর নামের একটা গলি এখনও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর সার্বোক পাঁচিল বরাবর এঁকে-বেঁকে বিবেকানন্দ রোডে গিয়ে পড়েছে।

নীলমণি ঠাকুর শেষ জীবনটা গঙ্গার ধারে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কাটাবেন বলে, চট্টগ্রামের চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে যখন কলকাতায় ফিরে এলেন তখন একটা গোলমাল বেঁধে গেল সম্পত্তির ভাগ নিয়ে। ঠিক ব্যাপারটা কি হয়েছিল তা' আজ বলা সম্ভব নয়— তিনরকম কথা শোনা যায়।

তার মধ্যে সবচেয়ে কম প্রামাণ্য কাহিনী হল নীলমণি ঠাকুরের মেয়ে নেড়া দিদির। তিনি গল্পটা বলেছিলেন বৃদ্ধবয়সে তাঁর ভাইপো রমানাথ ঠাকুরের স্ত্রী জগদম্বা দেবীকে।

নীলমণি চাকুরী করে টাকা পাঠাতেন কলিকাতায়। দুই ভাইয়ে ঠিক ছিল যে, যে যা

রোজগার করবেন সব ঐ একসঙ্গে জড় করে পারিবারিক সম্পত্তি বলে ধরা হবে। একবার নীলমণি একটা বাড়ী করবার মনস্থ করে ভিৎ খুঁড়তে গিয়ে প্রায় ৫০,০০০৲ টাকার সোনা পেলেন। সেটা ত' আর রোজকার করা টাকা নয়, তাই সেটাকে নিজের মেয়ের জন্য রাখবেন স্থির করেছিলেন। দর্পনারায়ণ তাই না শুনে রাগ করে পারিবারিক হিসাবের খাতাপত্রগুলো পর্যন্ত পুড়িয়ে দিয়ে বলেন যে তা' হলে একটা পয়সাও আর তিনি দাদাকে দিতে বাধ্য নন। যদি পারেন ত' নীলমণি আইন-আদালত করে আদায় করুন।

নীলমণি বল্লেন "তুমি আমার ছোটভাই, ছেলের মত দেখি। তোমার নামে নালিশ মামলা করব কি!" এই বলে তিনিও খুব রাগ করে বসতবাড়ীর পিছনে শুঁড়িদের বাড়ীতে গিয়ে বসে রইলেন। সে বেচারীরাও ব্যতিব্যস্ত। তাঁদের বাড়ীতে ত' ব্রাহ্মণ খেতে পারেন না, অথচ ব্রাহ্মণ অভুক্ত থাকলে তারাই বা খায় কি করে? এদিকে নীলমণি ঠাকুর বল্লেন যে, যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছেন, সে বাড়ীতে আর উনি ঢুকবেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা নীলমণিকে জোড়াসাঁকোয় যে একটুকরো জমি ছিল সেইটাই যৎসামান্য মূল্যে লিখে দিলেন, কারণ নীলমণি আবার দান গ্রহণ করতেও রাজি নন। নীলমণি ঠাকুর সেখানে এসে বাস করতে আরম্ভ করলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের বর্ণিত কাহিনীটা কতকটা অন্যরকম। তিনি এটা বলেছেন ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে। তখন জোড়াসাঁকো বাড়ীর ঠাকুর দালানে প্রত্যহ সকালে পরিবারের সকলে মিলিত হতেন। মহর্ষি নিজে উপাসনা করতেন ও উপদেশ দিতেন। ঐরূপ উপসনার পর উপদেশকালে বলেন—"আমার প্রপিতামহ নীলমণি ঠাকুর। তিনি তাঁহার ভ্রাতা দর্পনারায়ণের সহিত কলহ করিয়া এইস্থানে আমাদের ভদ্রাসন স্থাপিত করিলেন। বিশ্বস্ত হৃদয়ে তিনি দর্পনারায়ণের নিকট অনেক মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি কহিলেন, তুমি আমার নিকট মুদ্রা রাখ নাই; তাহাতে আমার প্রপিতামহ এইমাত্র বলিলেন "তুমি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বলিলে আমি আর তোমাকে কিছুই বলিব না। তিনি তাহাই করিলেন; সুতরাং ইনি কেবল ইঁহার আপনার একটী শালগ্রাম ঠাকুরকে তাঁহাদিগের গৃহ হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়া এই গৃহে স্থাপিত করিলেন।"

এ সম্বন্ধে তৃতীয় বর্ণনাটি পাই জেমস্ ফ্যারেল সাহেবের "দি টেগর ফেমিলি" গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন যে নীলমণি ঠাকুর এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে গচ্ছিত মুদ্রা ও পৈতৃক সম্পত্তির সব ছাড়িয়া দেন। কিন্তু ঐ লক্ষটাকাই যদি নীলমণি গোড়াতেই পান ত' যোড়াসাঁকোয় এসে চালাঘরই বা বাঁধবেন কেন, ফের চাকুরী করতেই বা যাবেন কেন?

সম্ভবতঃ নীলমণি ঠাকুর চট্টগ্রাম থেকে ফিরে এসে সমুদয় সম্পত্তি, এমন কি তেজারতির দ্বারা বন্ধিত বিষয়েরও অর্দ্ধাংশ চেয়েছিলেন। দর্পনারায়ণ তা দিতে অস্বীকার করায় শেষ পর্যন্ত রাগারাগি এতদূর গড়াল যে দর্পনারায়ণ গচ্ছিত টাকা পর্যন্ত দিতে গররাজি হলেন। তখন নীলমণিও রাগ করে জোড়াসাঁকোয় চলে আসেন। ছোট ভাইয়ের নামে মকদ্দমা করার চেয়ে তিনি লক্ষ্মী জনার্দ্দন শিলাটী সঙ্গে করে গোকুল দত্তের কাছে নামমাত্র মূল্যে খরিদ করা জায়গায় চালাঘর বাঁধেন। প্রথম কুঁড়ে ঘরটী বাঁধা হয় এখনকার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর উত্তরপূর্ব্ব কোণে —বারাণসী ঘোষ লেনের পাশে যে পুকুর ছিল তারই পাড়ে। ঐ গলির অপর পারের জমিগুলি এখনও দত্ত বা 'দাঁ' বংশীয়দেরই আছে।

পরে ১৭৮৪ সালের জুনমাসে ভদ্রাসনটী চিৎপুরের দিকে সরিয়ে এনে তৈরী আরম্ভ হয়—সেইটাই বর্তমান মহর্ষি ভবনের পুরাতনতম অংশ। যে পুকুর পাড়ে গোড়ায় ঘর বাঁধা হয়েছিল সেটা অন্দরের পুকুর হিসাবে ব্যবহার হতে থাকে এবং এরই ধারে আঁতুড়ঘর বাঁধা হত।

সেইখানেই কয়েকবৎসর পর দ্বারকানাথের জন্ম।

চালাঘর বেঁধে নীলমণি ঠাকুর আবার রোজকারের চেষ্টা দেখতে লাগলেন। চাকুরী পাওয়া শক্ত হল না, কোম্পানীর কাছে তাঁর খুব সুনাম ছিল। এবার কোম্পানী তাঁকে বহাল করে পাঠালেন উড়িষ্যার কুঠিতে। সে সময়ে তমলুকও উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল। শোনা যায় নীলমণি ঠাকুরের যত্নেই দেবী বগলাভীমার পীঠ বনমধ্যে আবিষ্কৃত হয়।

ইতিমধ্যে চেষ্টাচরিত্র করে দর্পনারায়ণ আর নীলমণির বন্ধুরা একটা রফা দাঁড় করালেন। দর্পনারায়ণ লাখ খানেক টাকা ফেরৎ দিলেন ও নীলমণি পৈতৃক বিষয়ে সব দাবীদাওয়া ত্যাগ করলেন।

নীলমণির পাঁচ ছেলে — তার মধ্যে প্রথম দুটীর বংশ নেই; বাকী তিনটীর নাম রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভ।

শুনা যায় অপরাহ্ণে হাওয়া খেতে বাহির হওয়ার প্রথা রামলোচন ঠাকুরই প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি লম্বা কোর্ত্তা, দোপাট্টা ও তাজ পরে তাজামে চড়ে বাড়ী থেকে বেরুতেন। তখনকার কালে সাধারণ ভদ্রলোক পাল্কী ও ধনীলোকেরা তাজাম ব্যবহার করতেন। পোষাকের মধ্যে তখন চল ছিল খিরকাঁদার পাগড়ী, চুড়িদার পাজামা, জোড়া ও দোপাট্টা। যুবকদের সাজ ছিল তাজ, সদ্‌রি (ফতুয়া), লম্বা কোর্ত্তা, রুমাল, দোপাট্টা আর ধুতি। মধ্যবিত্তেরা পরতেন বেনিয়ান আর উড়ানী।

রামলোচন বড় রাস্তা হয়ে চোর বাগানে কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুরের বাড়ী, পাথুরেঘাটায় আপনাদের পৈতৃক বাড়ী ঘুরে নানা দেবালয় দর্শন করে সন্ধেবেলা ফিরতেন। সে সময়ে সন্ধ্যা কাটাবার জন্য বাইনাচ আর কালোয়াতী গান ছাড়া অন্য কোন মজলিস আমোদের চল ছিল না। মহারাজ নবকৃষ্ণের কবি ও হাফ্ আখ্‌ড়াই তখন কিছুটা জমেছে তবে সেটা গুটীকতকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাহেব সওদাগর আর আমীর চাঁদ, রাজা হাজারীমল শেঠ বসাকদের মজলিসি আমোদের জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে কয়েকঘর বাইজী তখন কলকাতায় এসে মেছুয়াবাজার অঞ্চলে বাসা বেধেছে। রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি তখন বেঁচে বটে, কিন্তু তাঁদের আদর তখনও সার্বজনীন হয় নি। রামলোচন ঠাকুরই এইসব কবি আর কালোয়াতদের ডেকে নিজ বাড়ীতে মজলিসি আমোদের বৈঠক করতেন আর আত্মীয় স্বজনদের নিমন্ত্রণ করে শোনাতেন। "এইরূপে রামলোচন ঠাকুর হইতেই উহার আদর সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।"

রামলোচনের ভাই রামমণির পুত্রভাগ্যাছিল দুর্লভ। একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ব্রাহ্মণ রামমণি—তাঁর দুই ছেলেই নিজেদের চেষ্টায়, অর্থে গৌরবে, বিদ্যায় দেশের প্রধান হয়েছেন এরকম খুব কমই দেখা যায়। এই দুইভাই দ্বারকানাথ ও রমানাথ যে তখনকার বাংলায় কতখানি প্রধান ছিলেন তার একটা উদাহরণ মেলে ১৭৬৬ শকের ২৩শে বৈশাখের সংবাদভাস্করে রামমণির দ্বিতীয়া স্ত্রী দুর্গামণি দেবীর মৃত্যুর সংবাদ— "এক প্রধান মাতার গঙ্গা প্রাপ্তি" এই শিরোনামায়।

"গত শনিবার বেলা দশ ঘন্টার পর শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ ঠাকুরের পুণ্যবতী মাতা সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। আমরা শুনিলাম তাঁহার ওলাউঠা হইয়াছিল, কিন্তু ডাক্তার সাহেবদিগের কোন ঔষধ গ্রহণ করেন নাই। বাবু রমানাথ ঠাকুর ধনিশ্রেষ্ঠ দয়ানাবর সদাশয় মনুষ্য। কলিকাতার কোন অট্টালিকার উপর আরোহন করিলে তাঁহার নূতন বাড়ীর সোপানচূড়া সর্বোপরি উচ্চ দেখা যায়। অতএব রমানাথ বাবু মাতার শ্রাদ্ধও সর্বাপেক্ষা উচ্চ করিতে পারেন, বিশেষতঃ এই ধর্ম্মচারিণী শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিমাতা। ইঁহাকে ইন্দ্রমাতা বলিতে হয়, ইনি

ইন্দ্র ও উপেন্দ্র দুই পুত্র রাখিয়া গঙ্গাপ্রাপ্তা হইয়াছেন। লোকেরা ধনে মানে সর্বপ্রকারে দ্বারকানাথ বাবুকে কলিকাতার ইন্দ্ররূপ জ্ঞান করেন। অতএব ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা আশা করিতে পারেন ঠাকুর বাবুর মাতার শ্রাদ্ধে সভাস্থল কেবল স্বর্ণ রৌপ্যে শোভায়মান হইবে। পিত্তল নির্মিত গাড়ু-ঘড়া বিদায় সর্বত্র হইয়া থাকে। এ শ্রাদ্ধে অঞ্জলীপূর্ণ সুবর্ণ সহিত সোনারূপার গাড়ু-ঘড়া বিদায় হইলে শোভা পায়। দ্বারকানাথ বাবু বায়ু সেবনার্থ দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া ১০।১২ লক্ষ টাকা উড়াইয়া দিয়াছেন, তাঁহার বিমাতার শ্রাদ্ধে কি দান বিতরণ করিতে তিনি ছাড়িয়া কথা কহিবেন অতএব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আশীর্বাদ করুন ও ওলাউঠা সুখে থাকুক। এ বৎসর ওলাউঠা হইতে অনেক উপকার প্রাপ্ত হইলেন।"

এই দুর্গামণি দেবী ছিলেন যশোহরের জগন্নাথপুরের রায় চৌধুরীদের মেয়ে। তাঁর ছেলে রমানাথ হলেন ঠাকুর বাড়ীর কয়লাহাটা অংশের প্রতিষ্ঠাতা। কোম্পানীর কাছে "মহারাজা" খেতাব পেয়েছিলেন। এর বাড়ী ছিল রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট যেখানে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটের উপর পড়েছে, সেইখানে। বড় রাস্তার মাঝখানে যে মন্দিরটা যাতায়াতের পথে পড়ে, সেটা ছিল তাঁদের বাগানের এক অংশে। রমানাথ ঠাকুরের মর্ম্মর মূর্ত্তিটা এখনো দেখতে পাওয়া যায় টাউন হলের পিছনে দিকটায় আধা-অন্ধকারে— কলকাতার অনেক পুরাণো স্মৃতি নিয়ে বসে আছে।

রামমণির প্রথমা স্ত্রী যশোহরের দক্ষিণডিহির রামকান্ত রায় চৌধুরীর মেয়ে মেনকা দেবী। দুই ছেলে রাধানাথ ও দ্বারকানাথ ও দুই মেয়ে জাহ্নবী ও রাসবিলাসিনীকে রেখে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

রামলোচনের স্ত্রী অলকা দেবী ছিলেন এই মেনকা দেবীর আপন বোন। রামমণি ও রামলোচনের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব না থাকলেও অলকা ও মেনকা দেবীর মধ্যে প্রীতি ছিল প্রগাঢ়। অলকাদেবীর বড় দুঃখ তাঁর ছেলে নেই, তাই বোন মেনকা কথা দিয়েছিলেন যে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রকে তিনি বোনকে দেবেন পোষ্য নিতে। রামমণি এ কথা জানতেন না। তিনি যখন শুনলেন যে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রকে ভাই পোষ্য নিতে চান তখন ঘোর আপত্তি তুল্লেন কিন্তু মেনকাদেবীর জেদ ও কান্নাকাটিতে, আর তার চেয়েও বোধহয় যখন বিষয়ী বুদ্ধিতে খতিয়ে দেখলেন যে রামলোচনের সম্পত্তিটাও পাওয়া যেতে পারে তখন আর বিশেষ কোন বাধা দিলেন না।

এর কিছুদিন পরেই রামমণি পাগল হয়ে যান। লোকে বল্লে যে ছেলেকে ভাইয়ের হাতে দিতে হয়েছে এতেই মাথার গোলমাল হল। মেনকাদেবীও দ্বারকানাথের জন্মের এক বৎসরের ভিতরেই মারা যান।

দ্বারকানাথের জন্মের প্রায় একই সময়ে রামলোচনের একটী কন্যা জন্মে অল্পদিন মধ্যে মারা যায়। সম্ভবতঃ দ্বারকানাথ দত্তক মাতারই স্তনদুগ্ধে প্রতিপালিত হন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে যে দিদিমার কথা লিখেছেন তিনি এই রামলোচন পত্নী অলকা দেবীই।

এঁকে রোজ ভোরে এক ব্রাহ্মণ নামসংকীর্তন করে ঘুম ভাঙাতো। তাই অলকাদেবী দ্বারকানাথকে বলেছিলেন "এই ব্রাহ্মণকে দেখো। এ যেন কষ্ট না পায়।" অলকাদেবীর মৃত্যুর পর একদিন ব্রাহ্মণ তাঁর কাজে আসতে দ্বারকানাথ জিগেস করলেন সুখে জীবন কাটাবার জন্য ব্রাহ্মণের কত টাকা দরকার। ব্রাহ্মণ বল্লেন — "আমি গরীব ব্রাহ্মণ, আমার কিই বা এমন চাই, আপনার একদিনের আয়েই বোধহয় আমার সারাজীবন সুখে কেটে যাবে।" দ্বারকানাথ তৎক্ষণাৎ বল্লেন "বেশ, আজকের আয় আপনাকে দিলাম।" অদৃষ্টক্রমে সেইদিনই এণ্ডচেঞ্জএ একটা

বড় আফিসবাড়ী বেচাকেনা করে দ্বারকানাথ বহু হাজার টাকা লাভ করেন। ঐ টাকার এক এক পয়সাও নিজে না নিয়ে ঐ ব্রাহ্মণের ভরণার্থে মহাপ্রভুর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেন। লালাবাবুর বাজারের প্রায় সম্মুখে দক্ষিণ দিকে রাস্তার উপর এই নিতাইচৈতন্য বিগ্রহের মন্দির আছে। *

রামলোচন পোষ্যপুত্রকে অল্পবয়স্ক রেখেই ১৮০৭ খৃঃ এর ১২ই ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন। তিনি উইল করে সব সম্পত্তি দ্বারকানাথকে দিয়ে যান। দ্বারকানাথ প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত সব কিছুর ভার ছিল অলকাদেবীর উপর। **

---

* এই গল্পটি ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজমামা বলেন জোড়াসাঁকো বাড়ীতে। এর সত্যাসত্য অনুসন্ধান করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

** রামলোচন ঠাকুরের উইলের কপি।

রামলোচন ঠাকুরের উইল —

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং

লক্ষ্মীজনার্দ্দন —

প্রাণাধিক শ্রীযুত দ্বারিকানাথ ঠাকুর

চিরজীবেষু

লিখিতং — রামলোচন ঠাকুর

উইল পত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমি শরীরিক পীড়িত ভদ্রাভদ্র সঙ্কেই তুমি আমার পুত্র একারণ আপন জানপূর্ব্বক ও সেচ্ছাধিন এই উইল করিতেছি আমার পৈতৃক দৌলাত নাই। শ্রীশ্রী ঠাকুর ও জায়গা ও বাটী ও এলবাস পোষাক তাবা পিতল কাঁসার ও রূপা সোণার বাসনদিগর সেওয়ায় গহনা পৈতিক যা কিছু আছে ইহার তিন অংশের এক অংশ আমি পাইব দুই অংশ ভায়ারা পাইবেন পৈতিক ও আমার দত্ত সোনা রূপার গহনার অংশ হইবেক না, জাহার জে চিহ্নিত আছে সে তাহারই থাকিবেক। আর সংসারের খরচ ও ধর্ম্মতলার বাটীদিগর বাননতে মবল গহায় আমার নিজ টাকা বিং খাতা রোকড় ভায়াদিগের স্থানে আমার পাওনা আছে এবং অন্যঅন্য লোকের স্থানেও জে পাওনা আছে আমার দেনা নাই এই সকল পাওনা ও পৈতিক হিস্যা ও আমার স্বোপার্জ্জিত দৌলাত ও সোনারূপার বাসন ও এলবাস পোষাক ও জেলা যশোহরের মোতালক পরগণে বিরাহিমপুর জমিদারী ও সহর কলিকাতার মধ্যের খরিদা জায়গা ওগায়রহ সেওয়ায় রতন রাড়ের দরুণ বাটী আমার সোর্জ্জিত ও পৈতিক হিস্যা জে কিছু সব তোমাকে দিলাম রতন রাড়ের দরুণ বাটী খরিদ করিয়া তৎকালীন তোমার মাতাকে দিয়াছি এবং সন ১২১৩ সালে তোমার মাতার পুণ্যক্রিয়া অর্থে আমি তুষ্ট হইয়া সিক্কা ১০,০০০ দশ হাজার টাকা দিয়াছি এ টাকা এবং রতন রাড়ের দরুণ বাটী ইহার সহিত তোমার এলাকা নাই ইহার দান বিতরণ এক্তার তোমার মাতার। এখনও তুমি নাবালক একারণ এই জমিদারি ও গায়রহ জে কিছু বিসয় তোমাকে দিলাম ইহার কর্ম্মকার্য্য জাবত আমি বর্ত্তমান থাকিব তাবত আমিই করিব আমার অবর্ত্তমানে জাবত তুমি বয়সপ্রাপ্ত না হও তাবৎ পরগণাদিগর এ সকল বিষয়ের কর্ম্মকার্য্য ও সহী দস্তখত ও বন্দবস্ত ও হুকুম হাকাম সকলি তোমার মাতা করিবেন তুমি প্রাপ্ত বয়স হইলে জমিদারিদিগর আপন নামে হজুর লেখাইয়া এবং আপন এক্তারে আনিয়া

জমিদারির ও সংসারের কর্ম্মকার্য্য ও জমিদারির বন্দবস্ত ও খরচপত্র ও গায়রহ তোমার মাতার অনুমতি ও পরামর্শে তুমি করিবা এবং জাবত তোমার মাতা বর্ত্তমান থাকিবেন তাবত পরগণার মুনাফা ওগায়রহ জে কিছু আমদানির তহবিল তোমার মাতার নিকট জেমন আমি রাখিতাম তুমিও সেই মতো রাখিবা। আমি ও তোমার মাতা যাবৎ বর্ত্তমান ও বর্ত্তমানা থাকিবেন ও থাকিব তাবত আমারাদিগর পুণ্য ক্রিয়া আদি যে কিছু খরচপত্র এই দৌলাত হইতে পাইব। আমার সোপার্জ্জিত জায়গার কবালা ও বয়নামা ও গায়রহ আমার স্থানে ছিল। নিস্তীমতো তোমাকে দিলাম পৈত্রিক জায়গা ও বাটীদিগরের কবালা ও পাট্টা ও গায়রহ কাগজ রামমণি বাবুর স্থানে আছে জায়গা হিস্যা চিহ্নিত মতো বুঝিয়া লইবা এতদর্থে উইলপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২১৪ সাল বারোসএ চৌদ্দ সাল তারিখ ২২ অগ্রহায়ন —

ইশাদি —

শ্রীরামসুন্দর শর্ম্মণঃ সাং — শ্রীদুর্গাপ্রসাদ শর্ম্মণঃ সাং পালপাড়া জেলা নদীয়া — শ্রীজগন্নাথ শর্ম্মণঃ সাং চেঙ্গাটিয়া, পঃ জসোহর

অপ্রকাশিত পদাবলী

অন্নপূর্ণা ভাদুড়ী

ক্রমাবলোপমান লোকসাহিত্য ও পুঁথিসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একদল শিক্ষিত, উৎসাহী ও সচেতন হয়ে উঠেছেন, অত্যন্ত আশার কথা। ময়মনসিংহ গীতিকা বা পূর্ববঙ্গগীতিকার পর থেকে এযাবৎ লোকমুখে প্রচলিত অসংখ্য পদাবলী, গাথা ইত্যাদি সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। পুঁথির দ্রুত অপসৃতির মূলীভূত অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে বাংলার জলবায়ুর আর্দ্রতা সর্বপ্রধান। মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙন, অনিবার্য ক্ষয়িষ্ণুতা, সম্পত্তি হস্তান্তর এসবই বহুলাংশে কার্যকরী, তা ছাড়া মূল্যবোধ সম্পর্কে অজ্ঞতা আর সমষ্টিগতভাবে জাতির মজ্জাগত ঔদাসীন্য, এর ফলে বাস্তবিকই অনেক মহামূল্য রত্ন বিস্মৃতির সাগরে তলিয়ে গেছে। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে দেশজুড়ে সংগ্রহ প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। তার ফলে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের লোকসাহিত্য নেপথ্যে রয়ে গেছে। নদীয়ার পল্লীসঙ্গীতগুলি এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। সম্প্রতি কিছু কাজ সুরু হয়ে থাকলেও খুব বেশি দূর এগিয়েছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এইরকম একটা প্রচেষ্টার সময় নদীয়ার পল্লীঅঞ্চল থেকে আদ্যন্তবিহীন একটি পুঁথি হস্তগত হয়। পুঁথির পত্রাঙ্ক ১৫ থেকে ২৬। ধারাবাহিক একটি পালা বা কাহিনীর যোগসূত্র নেই। বিষয়বস্তু বৈষ্ণবকেন্দ্রিক। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, সখী ও গৌরচন্দ্র প্রভৃতি চরিত্র মূলতঃ উপজীব্য। পদাবলী প্রচলিত ভণিতা যথারীতি ব্যবহৃত হয়েছে। দু-একটি পদ ভণিতা-বিহীন।

পুঁথিটি সম্পর্কে অভিজ্ঞমহল মনে করেন তার বয়স একশ' বছরের বেশি নয়। সেকথা মানা হলেও, পদগুলির ব্যাপারে মুদ্রাযন্ত্রের দাক্ষিণ্যগ্রহণ নিশ্চয়ান্ত কয়েকটি কারণে কার্যকরী মনে হয়েছে।

প্রথমতঃ, পুঁথির অর্বাচীনতা মূল পদের অর্বাচীনতা প্রমাণ করে না। দ্বিতীয়ত, কোন মুদ্রিত ও প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে পদগুলির সন্ধান না পাওয়ায় প্রখ্যাত সাহিত্য-ঐতিহাসিক ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের শরণাপন্ন হই। তাঁর নির্দেশিত কয়েকটি স্বল্পপ্রচলিত পদসংগ্রহ গ্রন্থে পদগুলির মূল পাওয়া যায়নি। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে পদগুলি বাংলাসাহিত্যে নূতন সংযোজন। (এ অনুমান ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ সমর্থন করেছেন।।) তৃতীয়তঃ উল্লেখযোগ্য—এর মধ্যে বিভিন্ন পদকর্তার ভণিতা ব্যবহার। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও গবেষক মহলে প্রত্যেক পদকর্তার পদসমূহ সর্বাঙ্গীন সংগ্রহের প্রবণতা ধরা পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কয়েকটি সুসম্পাদিত পদাবলী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া একক পদকর্তার পদসমূহ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন আলোচ্য পদগুলি—অর্থাৎ যে কোন সংগৃহীত পদই বিচার-বিবেচনার জন্য তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য। চতুর্থতঃ, পদগুলির প্রায় সমস্তই সাধন-বিষয়ক। সাধনার সংকেতসমূহ আপাত দুর্বোধ্য হলেও মোটামুটি হিসাবে পদগুলি সহজ-সাধন বিষয়ক। সাহিত্য ও ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতায় প্রবেশ না করেও স্বীকার করা যায় যে বাংলা সাহিত্যের উন্মেষযুগই তো একান্তভাবে সহজ-সাধন-বিষয়ক চর্চাশ্রিত। বিভিন্ন ধর্মাদর্শের সঙ্গে জড়িত সহজসাধনার ধারা বৌদ্ধসহজিয়া, তান্ত্রিক সহজিয়া, বৈষ্ণব

সহজিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন আখ্যা গ্রহণ করলেও সাধনবিষয়ক সাহিত্যের একটি ক্রমপ্রবহমানতা আজ পর্যন্ত বজায় আছে। সেই বিশিষ্টধারার পটভূমিকায় এই পদগুলির নিজস্ব মূল্য অবশ্য বিচার্য।

পঞ্চমতঃ, সাহিত্য-মূল্যের দিক দিয়েও কয়েকটি পদ সমৃদ্ধ। জ্ঞান (দাস ?) ও চণ্ডীদাস ভণিতাঙ্কিত কিছু সংখ্যক পদ উল্লিখিত পদকর্তাদের সুপ্রচলিত বিশিষ্ট পদসমূহের সমপর্যায়ের। অননুকরণীয় সহজপ্রকাশের স্বচ্ছতা সংবেদনশীলতায় স্থানবিশেষে অতলস্পর্শী। পুচ্ছগ্রাহী বৈষ্ণবপদাবলীর সর্বগ্রাসী মহিমা সম্পূর্ণ অপসারিত করলেও পদগুলির আস্বাদ্যতা সর্বত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে গীতিকবিতার লক্ষণ পরিস্ফুট।

ষষ্ঠতঃ, অধুনাপ্রাপ্ত আলোচ্য পদগুলির সঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত পদসমূহের তুলনামূলক আলোচনা উল্লিখিত এবং অন্যান্য দিক থেকে মূল্যবান। মুখবন্ধের এইখানেই পরিসমাপ্তি। এখন পত্রাঙ্কের ক্রমানুসারে মূল পুঁথির সংযোজন করা যাচ্ছে। আলোচনাংশ নিতান্ত অপরিসর। যা দু-একটি মন্তব্য করা হয়েছে তা নিতান্ত আকস্মিক। যথাযথ বানান ও ছেদসহ পদগুলি মুদ্রিত করা গেল।

প্রথম পদ ঃ—

দিক্ষাগুরুর অগ্রগণ্য দুই শিক্ষাগুরু। দিক্ষাগুরুকে জানি কৃষ্ণের স্বরূপা।
দিক্ষাগুরুর পশ্চাৎগণ্য দুই শিক্ষাগুরু॥ মন্ত্রদিয়া আত্মসাত এই তার কৃপা॥
দুই শিক্ষাগুরু আর সকলি মিশাল। শিক্ষাগুরু হয় রাগাত্তিকা নাম।
সপ্তগুরু এক হইলে শিষ্যের করে ভাল॥ যাহার কৃপায় পাই বৃন্দাবন ধাম॥
আরপের জীউ আর মাধুর্যের বীজ। রূপবতী নবঙ্গ গুণ রস বিলাস।
দিক্ষাশিক্ষা মিশাইলে গুরু এক নিজ॥ এই ছয়গুরু হয় জানিহ নির্য্যাস॥

রূপ চক্ষে, রতি মনে, নবঙ্গ বক্ষে, গুণ হস্তে, বিলাস অঙ্গে, রস জিহ্বায়, অদ্বৈত পক্ষ, রাধা মধুর হয়, নিত্যানন্দ অনঙ্গরূপা রক্তময়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কেলি ভৃঙ্গ হয়। পদ্ম অনঙ্গমধু মদে সদা বিরাজয় ॥ ২৪ ॥

আনন্দ মদন দোঁহার ধাম। কল্পবৃক্ষ বলি তাহার নাম॥
প্রথম বৃক্ষের দুইটি শাখা। দ্বাদশপল্লব তাহার আগা॥
চৌষট্টিবরণ তাহার পাত। ছয়টি লতা না আছে তাত॥
ষোলটী ফল ফলিয়াছে তায়। জগৎ সহিতে লুটিয়া খায়॥
ষোলটী ফলের দুইটী বিচি। দাম অনন্ত তাহাতে রুচি॥ ২৫॥

পঞ্চদশ পৃষ্ঠায় ২৪ ও ২৫ সংখ্যক দুটি পদ। .২৫ সংখ্যক পদটির ভণিতায় অনন্ত দাসের নামাঙ্কন বর্তমান। পরবর্তী পৃষ্ঠায় ২৬ সংখ্যক পদে পাই নরোত্তম দাসেন ভণিতা।

তা দেখিয়া অদ্বৈত রায়, ধরনে নাহিক যায়,
দেখ দেখ নবদ্বীপে চাঁদের উদয়। নিরখই নিতাইর বদন।
তিন প্রভু এক ঠাই, সুখের অবধি নাই, বাহুর উপর বাহু তুলি দুটি ভায়ে কোলাকলি
নিরবধি হরিধ্বনি হয়॥ দোঁহে করে প্রেম আলিঙ্গন॥
এক প্রভু গৌরচন্দ্র, আর প্রভু নিত্যানন্দ, তিন প্রভু নদ্যার মাঝে, হরিধ্বনি বলে গাজে,
আর প্রভু অদ্বৈত নাগর। পতিত জনারে দেয় কোল।
হাঁসে কাঁদে গোরা গুণে, প্রেমধারা নয়নে, দাস নরোত্তম কয়, এই মোর আশা হয়,
অবনি করয়ে টলমল॥ যেন পাই যুগল চরণ ॥ ২৬॥

২৭ সংখ্যক পদটিও গৌরকেন্দ্রিক।

এক নাগরী বলে ওগো শুনগো মরম সই। রসের মালা গলায় দিয়া দেশান্তরী হব॥
রসিক জানিস রসিক বটাঁস তেঁইসে তোরে কই রসের চাঁদ কেমনে কৈ ডুব দেইগো মরে।
গুপ্তকথা কইতে বাধা না কহিলে নয়। সুখে থাকিবি মায়াগো রস কাঙ্গালি তোরা॥
আহা মরি নদ্যার চাঁদ নিগূঢ় রসিকময়॥ সাঁপের মণি সাঁপ থাকে বাহিরে আনিলে যায়।
হঠাৎ কালে দেখে এলাম নাজের মাথা খেয়ে। সহজ দেশের দেশ যেগো ভয়ে কেবা শুকায়॥
কেমনে দেখিলাম রসের বদন আড়ুনয়ানে চেয়ে॥ এদেশে কপাট দিলে সে দেশত পাই।
অনুমানে বুঝিলাম মনে রস রঙ্গনি তোরা॥ বাহির গাঁয়েতে কাজ নাই চল ভিতর গাঁয়ে যায়
মনের সাধে বসাইলি নবকিশোর গোরা॥ লোচন বলে হেদোগো নদ্যা নাগরি যত।
আর এক নাগরি বলে এদেশে না রব। গৌর প্রেমে বাঁধা গেলী এজনমের মত॥ ২৭ ॥

গৌরনামের অন্তরালে সহজসাধনার ইংগিত এবং হেয়ালীর ভাবটি অত্যন্ত স্পষ্ট। একাদশ পংক্তির পর থেকে সবটাই সাধন-সংকেত। সর্বশেষ পংক্তিতে গৌরচন্দ্র পুনরাবির্ভূত। পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ পংক্তির সঙ্গে চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পদ, "বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা" প্রভৃতির ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

১৭শ পৃষ্ঠায়,

একনাগরি বলে গৌর নাহিতে যখন যায়। হাস্যবয়ান রাঙ্গা নয়ান সেইটী রসের কুপ॥
ঘোঙ্গাটা খুলে নয়ান তুলে দেখিলাম আমি তার গোমটা দিয়ে জলকে যাবি হেট বদনে রবি।
রূপ দেখিয়া চমকি উঠে ঘরকে এলাম ধেয়ে। নদ্যার চাঁদের বদন দেখিলে ক্ষেপার পাড়া হবি
দুটী নয়ন রাঙ্গা হইল গৌর পানে চেয়ে। এবার দেখিলে মরিবি ক্ষেপার কুল রইবে নাই।
মনের ভিতর বসিয়াছে মন নেগেছে তায়॥ কুলশীল যদি রাখিবি তোরা থাক গিয়া বিরল
আর নাগরি বলে সই না কহিলে যে নয়॥ নদ্যায় রসের ফাঁদ পেতাছে নবকিশোর গোরা।
ধরম করম সব খোয়াবি দেখিবি রসের দেহ। সতী নারি মিছাই কুলের গরব করিস তোরা॥
কুল খোয়াবি বাতুল হবি লাগলে রসের লেহ॥ একথা শুনিয়া তার মনের ভিতর উঠিল অনুরাগ
বুঝি দশার দুকুল দোষায় মোর দশাবা ধরে। রাগের মনে রঙ্গ চড়িল গৌর রসের দাগ॥
তবে রসে মন ডবাইয়া থাকিব একই ঘরে॥ ভাল বলিলি নাগরি কুলে লাগিল রসের ঢেউ।
চাইতে নয়ান বাঁধা রাখে মনচোরা তাররূপ।

লোচনদাসের ভণিতাযুক্ত বহুসংখ্যক প্রচলিত পদের সঙ্গে উল্লিখিত পদটির ভাব ও প্রয়োগগত সাধর্ম্য লক্ষণীয়। ঊনত্রিশ সংখ্যক পদটি নিম্নরূপ ঃ

এক নাগরি হেসে বলে শুনগো মরম সই। গা থর থর করে আমার অঙ্গ সব কাঁপে।
তুইসে আমার মরম জানিস তেইসে তোরে কই॥ রূপের ঝলক নাসার জলক মনের ভিতর কাঁপে
তুবিনে গো মরম কথা কব কার ঠাই। সাধ করে গো দেখিতে গেলাম এমন কেবা জানে
এমন রসের মানুষ আমি কোথা দেখি নাই॥ অনুরাগে ডুবি দিয়া মন কেনে টানে॥
কিবা তার অঙ্গছটা রূপের ঘটা পথে চলে যায়। ডুবু ডুবু করে প্রাণ রইতে নারি ঘরে।
গৌররূপের ঠমক দেখি চমক লাগে গায়॥ নদ্যার চাঁদকে না দেখিলে প্রাণ সে কেমন করে।
আড়ুনয়নে ঘোমটা খুলে দেখিলাম আমি চেয়ে। সাঁপের মণি বাহির করিলে হারায় যদি মণি।
রসের নাটুয়া যায় নদ্যার বাজার দিয়ে॥ মণিহারা হইলে তবে না বাঁচয়ে ফনি॥
কি বা সে নালক জলদমতি নাসায় নলক দোলে। বিকাইলাম গোরাচাঁদের বদনপানে চেয়ে।
স্থির হইতে নারি গোরার হাঁসির হিল্লোলে॥ সুরধনিতে কুল মজাইলাম নাজের মাথা খেয়ে॥

যত্ন করি রত্ন রাখ বাহিরে রাখা নয়।
মনের ধনকে বাহির করিলে চৌকি দিতে হয়॥

লোচন বলে এসব কথা মরম বিনা কে বুঝে।
মোর মনে সে না বুঝিয়া বাক দ্বারে যুঝে॥ ২

পরবর্তী পৃষ্ঠায় (পত্রাঙ্ক ১৯) ৩০ সংখ্যক পদ ঃ

দুটি আঁখি ছলছল এক নাগরি বলে।
গৌরপ্রেমের কিবা জানি বলিতে অঙ্গ ঢলে
একদিনের সাধ আছে তার অধররস পাইতে।
মনের সাধে ভাবনা রেতে॥
যখন আমি শেষ নিশিতে ঘুমে হইয়াছি ভোরা।
স্বপ্নে যেন দেখিয়াছি আমি বুকের উপর গোরা
অপর সে পর স্বামী কি কব আর তোরে।
জুজলতা দিয়া বাঁধিয়াছে ধরেছে ঘুমঘোরে॥
নবকুশমার তনু ননির পুতলী যেমন।
কি রঙ্গ ধরে বাতুলী করে নদ্যার চাঁদ সে এমন

স্বপ্নে যেন কইয়াছি কথা বুকের উপর ধরে।
চাঁদ বিনা চকোরিণী জীবে কেমন করে॥
একথা শুনিয়া তার মন গলিল ঠেকিনু দুঃখের
বদন চেয়ে অধর রস পরিল আমার মুখে॥
সেই অধর রসেতে আমার প্রাণ সে জুড়াইল।
এমন সময় হেদে শুন গো নিশি পোহাইল॥
গৌর চাঁদকে জাগিয়া উঠিল চমকিয়া।
আরে বিধি রসের নিধি নিলি কেন দিয়া॥
লোচন বলে নব নাগরি কেন কিবা ডর।
গৌরচাঁদ তোর হিয়ায় আছে মন দঢ়ায়ে ধর॥

বিস্তারিত আলোচনা পরিহার করার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা এখানে বলা চলে। " বদন চেয়ে অধর রস **পরিল** আমার মুখে।" "ড়" ও "র" এর বিপর্যয় পরবর্তী আরও কয়েকটি পদে পাই। শেষপংক্তির পূর্বস্থিত দ্বিতীয় পংক্তির "দিয়া" কেবল মিল-সৌকর্যের জন্য ব্যবহৃত কিনা তা বলা কঠিন। পূর্ববঙ্গীয় ভাষার প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। লিপিকর অথবা রচয়িতার নিবাস সম্পর্কে এথেকে ইংগিত পাওয়া যেতে পারে। ৩০ সংখ্যক পদে 'কুশমার' শব্দটি বর্ণবিপর্যয় বলে মনে হয়। অবশ্য বর্তমান আলোচনায় ভাষাগত প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার স্থান সংক্ষিপ্ত। পরবর্তী পদটি চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত ঃ

সোনার সুরতি তোমার পীড়িতি
যতনে করেছি সার।
পীড়িতি অঞ্জন নয়নে ভূষণ
গলায়ে পীড়িতি হার ॥
পীড়িতি তিলক কপালে ধরেছি
পীড়িতি তাম্বুল মুখে।
পীড়িতি কুণ্ডল কর্ণের আভরণ
পীড়িতি চন্দন বুকে ॥
পীড়িতি পাদুকা চরণে পরেছি
পীড়িতি নূপুর তাতে।

পীড়িতি বসন করি পরিধান
পীড়িতি এদেহ রাখা।
ড়ৃতি আসনে উপবেশ করি
পীড়িতি মুকুট মাথে ॥
আনের সহিতে বচন কহিতে
পীড়িতি সাধিলে কাজ।
অভিলাষ মনে প্রেম রতি সনে
তোমার পীড়িতি মাথা ॥
তোমার পীড়িতি ভূষণ করিয়ে
চণ্ডিদাসে ছাড়ে লাজ ॥ ৩১ ।।

'জ্ঞান' (দাস ?) ভণিতাযুক্ত একটিমাত্র পদ পাই,

হেদেহে নাগর রসের সাগর
প্রবঞ্চনা কর কেনে।
রসের পাথারে ফেলাছ আমারে
চাহিয়া নয়ান কোনে ॥
অকুল পাথারে না জানি সাঁতার
কর্ণধারাহীন তরি।

ভাসিয়ে অকুলে ভাবের হিল্লোলে
নিরাশ্রয় সদা ফিরি ॥
আগে নাহি জানি প্রাণ গুণমনি
তোমার আঁখির গুণ।
না জেনে চাহিয়ে পাজর কাটিয়ে
পশ্যাছে পীড়িতি ঘুণ ॥

সকল পাঁজর ঘুনে জর জর
খসিতে আছয়ে বাঁক।
মরমের কথা মরমে রাখিয়া
কর্ণধার বলে ডাকি ॥
দেখি অকস্মাৎ নিশি সুপ্রভাত
আজি সে হইল মোর।

তোমার চরণ পেয়ে দরশন
সুখের নাহিক ওর ॥
আজি হইল মোর জনম সফল
তব দরশন পেয়ে।
জ্ঞান কহে আজি তোমারে দেখিয়ে
জুড়াইল মোর হিয়ে ॥ ৩২ ।।

উপরিউক্ত পদটির শৈথিল্য-বিহীন ছন্দোবন্ধ এবং ভাবও প্রকাশ ভঙ্গীর অনাড়ম্বর আভিজাত্য লক্ষণীয়। অন্তরের গভীর আকুতিরূপ স্পর্শমণির ছোঁয়ায় পাঠকচিত্ত স্বর্ণময় হয়ে উঠেছে। এই পদটিকে কতকাংশে গীতিকবিতার লক্ষণাক্রান্ত বলা অসঙ্গত নয়।

এরপর ২১ ও ২২শ পাতায় সাধন সংকেত বিষয়ক পদ পাওয়া যাচ্ছে।

মস্তক উপরে আছে অক্ষয় সরোবর।
সহস্রদল পদ্ম আছে তাহার উপর ॥
তারপরে কৃপাদৃষ্টি গুরু মহাশয়।
সহস্রদল পদ্মজানি তাহার নির্ণয় ॥
শুক্লবর্ণ ধরে সুধ প্রেমের গঠন।
গোপনে রাখিবেক মা অতি সংগোপন ॥
কেলিদীপ্ত তলে আছে রস সরোবর।
শতদল পদ্ম আছে তাহারি উপর ॥
পীতবর্ণ ধরে পূর্বরাগের গঠন।
রুকিনী সত্যভামা লইয়া করে বিহারণ ॥
ব্রহ্মস্থান মধ্যে আছে সিন্ধু সরোবর।
অষ্টদল পদ্ম আছে তাহারি উপর ॥
রক্তবর্ণ ধরে অনুরাগের গঠন।
অষ্টযুথেশ্বরী লইয়া করে বিহারণ ॥
অষ্টদলে অষ্টসখি সদা করে স্থিতি।
ষড়দলে দেখ নিত্য দোঁহার পীড়িতি ॥
নাভিদেশ মধ্যে আছে মান সরোবর।
ষড়দল পদ্মআছে তাহার উপর ॥
নীলবর্ণ ধরে সেই নিত্যের গঠন।
ষড়দলে অষ্টমমঞ্জরী করে বিহারণ ॥

চক্রপরি বৈসে দুই কিশোর কিশোরী।
মঞ্জরীগণ রহে সদা দোঁহ মুখ হেরি ॥
নাভির অধে আছে পৃথুসরোবর।
তিনপদ্ম আছে তার জলের উপর ॥
ভানপ্রেম রস এই তিন পদ্ম হয়।
তিন পদ্ম তিনরূপে অতি ঘোরা নয় ॥
দুই পদ্ম বিকশিত এক পদ্ম কোড়া।
অধোমুখ উর্ধমুখ দুই মুখ আছে জোড়
কোড়া পদ্মে বিরাজিত কিশোর কিশোরী।
কেবল জানয়ে তাহা শ্রীরূপ মঞ্জরী ॥
একপদ্মে বলরাম আর পদ্মে যোগমায়া।
দোঁহে আবরণ করে নৃত্য করে ছায়া ॥
প্রেম সরোবরে সুধ মাধুর্য বিশেষ।
কোটী মধ্যে হয় একজনের প্রবেশ ॥
কোড়াপদ্ম হয় প্রেম নৃত্য বৃন্দাবন।
ইহার অধিক নাই কহিল কারণ।
এক সরোবর মধ্যে তিন পদ্ম হয়।
তিন পদ্মে তিন বর্ণ কহিয়ে নির্ণয় ॥
শুক্ল রজনীল এই তিন বর্ণে স্থিতি।
কহে মুকুন্দ দাস সহজ পীড়িতি ॥

স্থাবর জঙ্গমশ্চৈব বিভূস্তানাং পরস্থিত। ত্রিকোন ত্রিধামশ্চ নৃত্য স্থানং মিতির্ণয় ॥ রামেচ গোলকশ্চৈব দক্ষিণাদ্রমং ব্রেজস্তথা। শোষক নিত্যস্থানশ্চ অধর দ্বারকাপুরি। যথা যোনিস্তথা রাধা পিঙ্গশ্চ নন্দনন্দনং। তদো উর্দ্ধোদয়ে পাত্র বাসুদেব সখারণং ॥ ৩৩।।

পুঁথির ২৩শ পৃষ্ঠায় ৩৪ ও ৩৫ সংখ্যক পদ।

রসিক বরণ অতি সে গোপন
তাহারা জানিবে কে।
রসিক সঙ্গে রসের পাথারে
যেজন সাঁতরাছে ॥

সেই সে রসিক সকল অধিক
কিবা সে জানিতে পারে।
নিজ দেহ দিয়া যে জন ভজয়ে
সেই সে পেয়েছে তারে ॥

শ্রীরূপ মঞ্জরী রস অধিকারী
সকল রসের সার।
নিজ দেহ দিয়ে তাহারে সেবিয়ে
থাকয়ে তাহার কাছে।
সাধু ভেলা হইয়া ফিরিয়ে ভ্রমিয়ে
কে বুঝে মরম তার ॥
কহে নরহরি শ্রীরূপ মঞ্জরী
নয়ন যুগলে আছে ॥ ৩৪ ॥

৩৫ সংখ্যক পদের প্রথম দুটি পংক্তি প্রচলিত চারটি পদে পাওয়া গেছে। কিন্তু পরবর্তী পংক্তিগুলি সম্পূর্ণ পৃথক।

পীড়িতি বলিয়া এতিন আঁখর
ভুবনে আনিল কে।
প্রেমের শৃঙ্গার পঞ্চম প্রকার
সেই সে জগত সার।
পরাণ ত্যজিলে পীড়িতি না ছাড়ে
পীড়িতি গড়ল কে ॥
নায়িকা সাধন করেছে যেজন
মরম পেয়েছে তার ॥
সৃষ্টি আদি করণ জীবাত্মা সহিত রমণ
সকল জগতে করে।
সেরতি সাধন করিল যেজন
পূরিল তাহার আশ।
প্রেমের রমণ কেমন গড়ন
কেবা সে জানিতে পারে ॥
নায়িকা দেহেতে রতির জনম
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাস ॥ ৩৫ ॥

নায়িকা সাধন শুনহ লক্ষণ
যেরূপ সাধিতে হয়।
সে রতি সাধন করয়ে যেজন
সেই সে সাধন সার।
শুষ্ক কাষ্ঠ সম আপনার তনু
তখন করিতে হয় ॥
ভ্রমরা হইব সন্ধান পূরিব
মরম বুঝিব তার ॥
যে কালে রমণ অনিত্য করণ
তাতে সাবধান হবে।
তারপরে জরদ বরণ
রতির জনম হয়।
মেঘের বরণ রতির গড়ন
তখন দেখিতে পাবে ॥
সাধিতে সে রতি কাহার শকতি
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয় ॥ ৩৬ ॥

রতির জনম কহিব কথন
যেরূপে থাকয়ে যথা।
নাভি পদ্মে রহে শুক্র রজবস্তু
রবির কিরণ তায়।
শ্বেতনীল পীত শোনিত বরণ
অতি অদ্ভুত কথা ॥
মন্দা ব্রহ্মস্থানে রহে নীল পীত রাঁ
শীতল কিরণ তায় ॥
শুক্ররজ বস্তু সৃষ্ট্যাদি রমণ
সকল জগতে হয়।
এ চৌদ্দ ভুবন করিয়া গঠন
তাহার গমন হয়।
নীলপীত রতি সাধন লক্ষণ
তার উর্দ্ধ পথে রয় ॥
রসিক বিহনে জানিতে নাপারে
দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয় ॥ ৩৭ ॥

২১ শ পদের পরবর্তী সমস্ত পদই একান্তভাবে সাধন বিষয়ক। পঞ্চবিংশ পৃষ্ঠায়,

শ্রীহরি শ্রীগুরু বৈষ্ণব করি নমস্কার।
সংক্ষেপেতে কহি কিছু সাধনের ॥
ঐশ্বর্য্য জগতে দেখ ঈশ্বরের খেলা।
মাধুর্য্য জনের মন হয় নরলীলা ॥
পূর্বে কৃষ্ণ এশর্য্য অপার আস্বাদিলা।

ঐশ্বর্য আস্বাদিয়া শেষে ভাবিতে লাগিলা ॥
এইরূপে নহিল মোর বাঞ্ছিত পূরণ।
জপতপ ব্রত দিক্ষা ধর্ম আচরণ ॥
বৈকুণ্ঠ হইবে প্রাপ্তি ঐহত কারণ।
আপনে মানুষ দেহ আশ্রয় হইব।
আস্বাদিয়া আপনে ভক্তেরে দেখাইব ॥
এই লাগিয়া ব্রজে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলা।
কিশোর বয়সে প্রেম সফল করিলা ॥
কৃষ্ণ কহেন হইলাম আমি মানুষ বিগ্রহ।
আপনি আচরি কৈল ভক্তে অনুগ্রহ ॥
রাধা প্রেম গুরু করিলা আপনে।
সাধ্য বস্তু কথা এই কৈল বিবরণে ॥
কৃষ্ণ কহেন হইলাম আমি মানুষ আশ্রয়।
মানুষ ভজন শ্রেষ্ঠ জানিহ নিশ্চয় ॥
আমার যে প্রিয়া তাহা কর আচরণ।
আপনি কহিলা কৃষ্ণ এই বিবরণ ॥
অতঃপর শুন কিছু মানুষ লক্ষণ।
মানুষ সভাতে জানিহ কারণ ॥
বেদধর্ম সঙ্গে করে প্রেম আচরণ।
বৈদভক্তি লোকাপেক্ষা না করে যাজন ॥
কামবসে করে প্রেম রসের উদ্যান।
সাক্ষাতে মিলয়ে তার রাধিকার চরণ ॥
সাক্ষাতে রসের স্বরূপ করয়ে প্রকাশ।
তথি আস্বাদয়ে শৃঙ্গার প্রেমের নির্য্যাস ॥
দোঁহে দোঁহার বিদগ্ধ হব প্রেমময়।
দোঁহে দোঁহার হৃদি অর্থ করি অনুনয় ॥
প্রেম বিনু রসিক তিলেক নাহি জীয়ে।
পীড়িতি জানিলে নবীন কিশোরী পাইয়ে ॥
যথা নায়ক নায়িকা লক্ষণ।
ধীর ললিত মানুষের শুন বিবরণ।
নির্বিকারে কামক্রিয়া তার আচরণ ॥
রসিক জনের এই প্রীত মন হয়।
তার মধ্যে আচরণ দুই বিধ হয় ॥
ভ্রমর সমান প্রেম বহুজনা করে।
আশ্রয় হইতে নারে বিষয় আচরে ॥
মধুকর মধু যৈছে করে আস্বাদন।
পাত্রে অনুরাগ নাই মধুপীতে মন ॥
ঐছে যার মনে আছে আত্মসুখ গন্ধ।
সে কেমনে ধরিতে প্রেমের সম্বন্ধ ॥
এমত নহিলে ভাই নহে কার্যসিদ্ধি।
আচরণ বিজাতীয় মানুষ নহে প্রাপ্তি ॥
অতএব চাতক লক্ষণ মানুষ লক্ষণ।
অতএব শুন কিছু চাতক লক্ষণ ॥
আশ্রয় বিষম প্রেম ভক্তি আচরণ ॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ চাতকের ধর্ম।
যেরূপে আশ্রয় হয় শুনতার মর্ম্ম ॥
পরোক্ষে ভজন রস সাক্ষাতে করিব।
রাগাত্তিকা দেখি তার আশ্রয় হইব ॥
লাবণ্য কারুণ্য মতে যেহত নায়িকা।
বিদগ্ধ স্ত্রীর রতি প্রেমেতে বিদিতা ॥
নবীন যোবনী কিম্বা স্পষ্ট যোবণী।
যোড়শলক্ষণ যুক্তা মানুষ তারে গণি ॥
গৃহপতি থাকিবে হইবে কিশোরী।
রূপে গুণে সমপ্রভা অদ্ভুত চাতুরি ॥
হঠাৎ কারে তেঁহো যদি অনুগ্রহ করে।
আশ্রয় হইয়া গুরু কহিব তাহারে ॥
নতুবা স্বধর্ম্ম তারে শিখাইব।
যোগ্যপাত্র করি পাছে রমণ করিব ॥
রমণ পশ্চাতে প্রেম করিব শিক্ষণ।
যেরূপে শিখিব তাহার শুন বিবরণ ॥
সত্যগুরু বস্তু বলি তাহারে জানিব।
সামর্থ নায়িকা সেই আর কি কহিব ॥
তাহা স্পর্শনে ভাব করিব উদ্দিপন।
কাম সম্বন্ধে প্রেম করিব নিরূপন ॥
আশ্রয় হইব তার প্রাপ্তিবস্তু জানি।
হীনবুদ্ধি করিলে ভজন জয় হানি ॥
তাররূপ দেখিব শ্রীরূপমঞ্জরী।
আত্তা আস্বাদিব তার স্বরূপ মাধুরী ॥
এইরূপে ছয় মঞ্জরীর গণ।
বিলাস করিয়ে কুঞ্জে এইত কারণ ॥
কহে চণ্ডিদাসে বিলাস মাধুরী।
ব্রেজের মাধুর্য প্রেম বুঝহবিচারি ॥ ৩৮ ॥

পদগুলির অবিকল উদ্ধৃতির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পুঁথির বয়স সম্পর্কে-ও কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেছে। তবে পুঁথিটি যে অন্য পুঁথির নকল এ অনুমান করা যেতে পারে। লেখার ছাঁদ, কাগজ ও কালি প্রায় সর্বত্র একই ধরণের। কিন্তু কতকগুলি পদে বর্ণাশুদ্ধি ও ছন্দ শৈথিল্য অত্যন্ত প্রকট। অর্থহীন কয়েকটি শব্দও পাওয়া গেছে। অপর কতকগুলি পদের ভাবগাম্ভীর্য ও প্রকাশভঙ্গীর অনবদ্যতা শ্রেষ্ঠ কবির শক্তির পরিচায়ক। সুতরাং আলোচ্য পুঁথিটির রচয়িতা ও লিপিকার অভিন্ন নয়। লিপিকার হয়ত বিভিন্ন মূল থেকে পদগুলি সংগ্রহ করে থাকবেন। কিন্তু মনে হয় স্থায়ী অজ্ঞতাবশতঃ ভ্রমপ্রমাদগুলি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

ধর্মের দিকটার বিশদ্ আলোচনা সম্ভব না হলেও পদগুলি যে একান্তভাবে সহজ সাধন বিষয়ক সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। সহজিয়া সাধকগণ সাধনার ক্ষেত্রে আপনাদের বৈষ্ণব-সহজিয়া, তান্ত্রিক সহজিয়া, বৌদ্ধসহজিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন আখ্যায় আখ্যাত করলেও ধর্মপ্রাণ রক্ষণশীল বৈষ্ণবগণ সহজিয়াদের আদৌ বৈষ্ণব বলে স্বীকার করেন না। তথাপি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিভিন্ন সহজিয়া ধর্মাশ্রিত পদের উল্লেখ পূর্বাচার্যগণ করে গেছেন। এবং বিভিন্ন সহজিয়া-গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টা যে আদৌ করেননি তা বলা চলেনা। কিন্তু স্থানসংক্ষেপের জন্য আমরা সে সব আলোচনার পুনরুল্লেখ সযত্নে পরিহার করব। তথাপি মোটামুটি হিসাবে দেখতে পাই সহজিয়া সাহিত্যে গুরুবন্দনার পদ, আসকের পদ, সাধনার পদ, মানুষের প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ প্রচলিত আছে। আলোচ্য সংগ্রহের অধিকাংশ পদই উল্লিখিত কোনও না কোনও পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। লক্ষণগুলি এত পরিস্ফুট যে তার নির্দেশ বাহুল্যমাত্র।

পদগুলি নিঃসন্দেহে পরচৈতন্য যুগের। "নদ্যার চাঁদ", "গোরা" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য নিতান্ত অমনোযোগী পাঠকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। অবশ্য কয়েকটি পদে তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেছে। জ্ঞান ও চণ্ডীদাস ভণিতাশ্রিত পদগুলি প্রায়শঃ এই পর্যায়ে পড়ে। চৈতন্য পরবর্তী সহজধর্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রায় ব্যাখ্যাত গ্রন্থে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থেকে শ্লোক উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই কারণেই *মণীন্দ্রমোহন বসু তাঁর "সহজিয়া সাহিত্য" গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকে সহজিয়া ধর্মের ব্রহ্মসূত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন। গুরুপর্যায়ে পরিগণিত অনেক বৈষ্ণব সহজিয়া গোস্বামী প্রভুদের পরবর্তী। সৈনিক দিয়ে বিচার করে বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রে এই সমস্ত গোস্বামীদের প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছেন, এবং এই মত অগ্রাহ্য করবার পিছনে যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। সহজিয়া সাধনার স্থিবিধ পন্থতি [(১) বাহ্যের সাধন ও (২) মনের করণ] বিষয়ক নির্দেশ আলোচ্য কয়েকটি পদে পাই। রূপকে আশ্রয় করে স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করার বিশিষ্ট পন্থতি আরোপ সাধন নামে সহজিয়া সমাজে প্রচলিত। এই আরোপ সাধনার উল্লেখ স্পষ্টতঃ একটি পদে পেয়েছি।

পূর্ব উল্লিখিত বিভাগসমূহের মধ্যে "আসক" শব্দটি সাধারণ্যে প্রচলিত নয়। শব্দটি মূলে আরবী। অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে বাংলা সাহিত্যে এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। শব্দটি ব্যবহারে সঙ্গে সুফী সংস্পর্শের দুরাগত রেশ ভেসে আসে। আসক অর্থে আসক্তি বা প্রেম, যাতে রূপের জন্ম হয়. রসের উপলব্ধি হয়। সহজতত্ত্বে 'আসক' বলতে শ্রীরাধাকে বুঝায়।

অদূর ভবিষ্যতে বাংলাসাহিত্যে এবং অন্যত্র সহজিয়া ধর্মের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে যথাযথ এবং বিস্তৃত আলোচনার একটি ধারাবাহিক বিবরণ প্রকাশিত হলে ভাল হয়।

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

জগর চোখ দুটি একটু বিস্ফারিত হয় বীণার। বলে। — আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে। মৃগনয়নী ভরসা পায়। বীণা চলে যায়। মৃগনয়নী বউটির উদারতার কথা বার বার ভাবে। যত ভাবে ততই মুগ্ধ হয়। বড় ভাল বউটি। বড় সুন্দর চোখদুটি। কেমন ছেলেমানুষের মত। মায়া মায়া চোখ। কি মিষ্টি কথা। ভরসা পেয়েছে মৃগনয়নী। সত্যিই ত' ওর কাছে টাকা নেই বলে-লেই হয়। গোটা পনেরো টাকা হয়ত আছে। সংসার খরচাও আছে। সংসারে আর কিছু সে দেখতে পারবে না। বনবিহারী না সেরে ওঠা পর্যন্ত। আজ ও যাবে কালো বৌকে আনতে। এই সুযোগে কালো বৌকে আনতে হবে। শুধু তাই নয়। কালো বৌ এলে তার যথেষ্ট উপকার হবে এ সময়। কিন্তু যাবে কখন? সন্ধ্যার পর যদি বনবিহারী একটু ঘুমোয় তবে যাওয়া যাবে। কতকাল পরে ও বাড়ীতে যাবে আজ। কে কি ভাববে, কার মুখ কেমন হবে ভাবতে ভাবতে একটু তন্ময় হয়ে যায় মৃগনয়নী। ঘরের বাইরে একটু কাসির শব্দে চমকে ওঠে। বনবিহারীও যেন হঠাৎ চমকে ওঠে।

—কে?

ডাক্তার ঢুকছে ঘরে।

—কি ব্যাপার? আমার স্ত্রী বলছিলেন—।

চেয়ার নেই ঘরে। তা হোক ষ্ট্রাউজার সার্ট পরে জানালার তাকের ওপরই বসে পড়ল ডাক্তার। বনবিহারী কিছু বলতে পারে না। মৃগনয়নী কপালের ওপর পর্যন্ত ঘোমটা রেখে বললে।— এই ত' অপিস থেকে এসেই জ্বর। সর্ব শরীর যন্ত্রণা। বড্ড কাতরাচ্ছে। ডাক্তার কাছে এলো। অনেকক্ষণ পরীক্ষা করলো। ভ্রু কোঁচকালো। চোখ বাঁকালো। মৃগনয়নী হাঁ করে দেখ-ছিল আর মাঝে মাঝে ভাবছিল। এই কালো মোটা কদাকার লোকটার এমন সুশ্রী লাবণ্যময়ী স্ত্রী! সংসারে কত আশ্চর্যই যে আছে! লোকটার গলাটাও কর্কশ। বড় বিশ্রীভাবে বললে।— আপনি কি মদ খান? বনবিহারী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়।—আজ্ঞে।

—আজ্ঞে নয়, সব কথা বলুন। মদ খেতেন? কতটা করে?

বনবিহারী যেন একটু ইতস্তত করে। মৃগনয়নীই বলে।—হ্যাঁ, খেতেন।

—আপনাকে ত' আমি জিজ্ঞেস করিনি। যাকগে, খুব বেশীই খেতেন বোধহয়?

বনবিহারী ঢোক গিলে বলে।—এই একটু বেশী মাত্রা মাঝে মাঝে।

—মাঝে-মাঝে নয়। রোজই হোত। তার ফলটা দাঁড়িয়েছে খুব সাংঘাতিক!

সাংঘাতিক কথাটা শুনে ভয় পেয়ে যায় বনবিহারী। মৃগনয়নী তক্ষুণী বুঝতে পারে। বলে ডাক্তারকে,—বীণা বুঝি আপনাকে খবরটা দিয়েছিল? কথাটা পালটাবার চেষ্টা করে। ডাক্তার বলে,—আজ্ঞে হ্যাঁ। বলে ওঠে। বলে,—আমার সঙ্গে কাউকে দিন ওষুধটা নিয়ে আসবে। মৃগনয়নী চারদিকে তাকায়। কমলকে দেখে না। বলে,— আচ্ছা আমি কমলকে পাঠাচ্ছি। ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে আসে।

—কেমন দেখলেন ডাক্তার বাবু!

—ভাল নয়। লিভারের আর কিছু নেই।

—সারবে ত'?— মৃগনয়নী গলাটা ভেঙে গেছে।

ডাক্তার এতক্ষণে একটু হাসে।— তাকি বলা যায়। চেষ্টা করতে হবে।

মৃগনয়নী নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলে,— আপনার টাকাটা—।

—এখন থাক। দিন দু' তিনের ভেতরে ভরসা দিতে পারি না। যে কোন সময় যে কোন ঘটনা ঘটতে পারে। হার্টও ভাল নয় কিনা? মাথার ভেতরটা ঝিম ঝিম করছে মৃগনয়নীর।

—সেবার ত্রুটি আশা করি হবে না। নমস্কার।

ডাক্তার চলে যায়। প্রায় টলতে টলতে ঘরে আসে মৃগনয়নী। আবার বুঝি ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ে। না। কিছুতেই ভেঙে পড়বে না। যা হবার হবে। নিজেকে দুর্বল করে ফেললে আরও বিপদ ঘটতে পারে। আপ্রাণ শক্তিতে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে মৃগনয়নী। বনবিহারী তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ফ্যাল ফ্যাল করে। শিশুর মত। মৃগনয়নীকে হাসতে হবে। ধরা পড়লে চলবে না। ভয় পেলে চলবে না। একটুও যেন বুঝতে না পারে বনবিহারী। ও অমন করে তাকাচ্ছে কেন? তবে কি ওর মুখে ভয় বোঝা যাচ্ছে। আরও একটু হাসতে চেষ্টা করে মৃগনয়নী। চোখদুটো খুব স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করে। একটু উদ্বিগ্ন ভাবও যেন বোঝা না যায়।

—ডাক্তার কি বললে?— জিজ্ঞেস করে বনবিহারী। অতি কষ্টে।

পারছে। মৃগনয়নী পারছে। হাসছে মৃগনয়নী। বললে,— আর আবার ছাই বলবে? দিন কত শুয়ে থাকলেই সেরে উঠবে।

—তবে সাংঘাতিক বললে কেন?

—ও অমনি। মদ খাও শুনে রেগে বলেছে।

মৃগনয়নী চোখদুটোকে যতটা সম্ভব ওর চোখের দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে নিয়ে জানালার দিকে তাকাতে তাকাতে এসে বসে। আবার পাখা হাতে নেয়।

সন্ধ্যার সময় কমল এলে ওকে টাকা দিয়ে পাঠায় ডাক্তারের বাড়ী ওষুধ আনতে। এর পর থেকে আর কোন কথাই ভাবতে পারে না মৃগনয়নী। কোন কাজ নয়। কোন চিন্তা নয়। শুধু ডাক্তার আর ওষুধ। ওষুধ আর ডাক্তার। কমলির মা এসে ছেলে দুটোকে দুটিখানি করে খাইয়ে দেয়। ঘুম পাড়িয়ে দেয়। মৃগনয়নী তাকিয়ে দেখেও না একবার। মাঝে মাঝে হাতের শাখার দিকে তাকায়। তাকাতে তাকাতে চোখদুটো ঝাঁপসা হয়ে আসে। একটু রগড়ে নেয় দুটো চোখ। পথ্য, থার্মোমিটার, ডাক্তার, ইনজেকসন। দিনরাত। রাতদিন। একদিন শুধু গয়নাগুলো জড় করে ডাক্তারের বৌয়ের হাতে তুলে দেয়।

—চারশ টাকা দিতেই হবে ভাই।

—চারশ! দেখি কাউকে বলে, আমার কাছে ত' নেই। দেখি বেনে বাড়ীর বৌয়ের কাছে পাই কিনা?

—বেনে বাড়ী কোথায়!

—সে আছে। কাল দুপুরে আসব।

ডাগর চোখদুটো বিস্ফারিত করে গয়নাগুলো পেট কোমরের আঁচলে বেঁধে নিয়ে যায় বীণা। টাকা পেল পরদিন মৃগনয়নী। মাত্র সাড়ে তিনশ।

—আর পঞ্চাশ টাকা কিছুতেই দিলে না ভাই।—তেমনি সরল ডাগর চোখ তুলে বলে বীণা।

মুখখানা কালো করে শুধু বলে মৃগনয়নী।— ও গয়না গড়াতে আমার সাতশ' টাকা লেগেছিল।

—তাই নাকি!—

টাকাটা হাতে নিয়ে আর কোন কথা বলে না মৃগনয়নী। বীণা চলে যায়। এরপর আর ওঠে না মৃগনয়নী। কোন চিন্তা নয়। কোন কথা নয় বনবিহারীর রোগা ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। মুখে ওষুধ, জল আর পথ্য। পাখা চলছেই সমানে। কমলির মা পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে যায়। এমন আর দেখিনি। শুনিওনি। ভবানী গালে হাত দেয়। ওর শরীর রক্ত মাংসের বলে মনে হয় না।

কিন্তু এত করেও কি কিছু ফল হয়? বনবিহারী কি বেঁচে উঠবে? বাঁচাতে কি পারবে ও? একদিন সব আশা বুঝি নির্মূল হতে চলল। সন্ধ্যা থেকে অবস্থা খুব খারাপ। দুপুর থেকে কথা বন্ধ হয়ে গেছে। হাত পা সব ঠান্ডা হয়ে আসছে। গলার কাছটা নড়ছে। বুকের ওঠানামা ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট। মৃগনয়নী পাষাণের মত বসে থাকে। এক ভাবে। নির্বাক। চোখের পাতাও বুঝি পড়ে না। সন্ধ্যার পর অবস্থা রীতিমত খারাপ হয়ে আসে। বাড়ীতে শুধু একটা অস্ফুট গুঞ্জন শোনা যায়। কমলির মার ফিসফিসানি, —আর কি বাঁচবে! ভবানীর মায়ের চাপা উত্তর। আর বোধহয় কয়েক ঘন্টা। রাত কি কাটবে? মুখ সব গম্ভীর। কমল অমল রয়েছে কমলির মায়ের ঘরেই। ডাক্তার এলো। হাতখানা তুলে নিলে হাতের ভেতর। স্টেথিস্কোপ লাগাল বুকে। মুখখানা আরও গম্ভীর হয়ে এলো। ব্যাগ থেকে বার করে ইনজেকসন দিতে হোল।

—বসে থাকতে হবে।

মৃগনয়নী ডাক্তারের দিকেও আর তাকায় না।

—খুব ঘামছে?

মাথা নাড়ে মৃগনয়নী।

—পাউডার মাখাল গায়ে। তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিল।

সেবায় মৃগনয়নীর তুলনা মেলে না। ডাক্তার বসে বসে দেখে। আবার মৃগনয়নী বাতাস করে। বাতাস করতে করতে তাকায় হাতের শাঁখার দিকে। ধবধবে সাদা শাঁখা। কি উজ্জ্বল! চোখদুটো শাঁখার ওপর থেকে ফেরাতে পারে না মৃগনয়নী। এ শাঁখায় ত' কোথাও ফাটল ধরেনি? না। কোথাও না। পরিষ্কার মসৃণ সাদা। আঁটসাট করে পরা মৃগনয়নীর হাতে। এই শাঁখা ভাঙবে? কে ভাঙবে? সংসারে এমন ঘটনা কি হতে পারে? আবার ইনজেকসন! ডাক্তার বসে আছে। চুপ করে। গালে হাত দিয়ে। জানালার তাকের ওপর। সময় আর কাটতে চায় না। প্রতিটি মুহূর্তকে নীরবে অনুভব করতে পারছে মৃগনয়নী। ডাক্তার ঘড়ি দেখছে মাঝে মাঝে। এ ধারে ও ধারে উঁকি ঝুঁকি। কমলির মায়ের চোখ দুটো জলে ভরা। যম মুখপোড়ার চোখও নেই গা! এমন সংসারটা এমন করে তইলে যাবে! সময় কাটছে। রাত প্রায় বারোটা বাজতে চলল। তেমনি বসে আছে ডাক্তার। তেমনি মৃগনয়নী। ডাক্তারের কর্কশ মুখখানা আজ কোমল মনে হয় মৃগনয়নীর কাছে। পরমাত্মীয় মনে হয় তাঁকে। প্রথম দিন ডাক্তারকে ভুল ভেবেছিল মৃগনয়নী। আজ অবাক করে দিল ডাক্তার। বাড়ী থেকে দুবার ডেকে পাঠিয়েছে বীণা চাকর দিয়ে।

—এখন যাব না। দেরী হবে।

ডাক্তার গম্ভীর মুখে বলে দিলে চাকরকে। বসে রইল তেমনি। চলল ওষুধ আর ইন্জেকসন। রাত আরও বাড়ল। প্রায় দেড়টার সময় বনবিহারী একবার পাশ ফেরবার চেষ্টা করল। একটু খেল। একটু তাকাল। ওষুধটা জিভে ঢেলে দিয়ে হাসল ডাক্তার।

—এ যাত্রা বোধহয় বেঁচে গেল! এখন আসি। তেমন বুঝলে ডেকে পাঠাবেন।

এতক্ষণে ব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল ডাক্তার। মৃগনয়নী একটু বোধহয় হাসল। উঠে দাঁড়াল

না। এগিয়ে দিল না। ওই হাসিটুকুই জানাল যে আপনি যা করলেন, কখনও ভুলব না।

বেঁচে গেল বনবিহারী। মৃগনয়নী যেন জোর করে ওর প্রাণটুকু রেখে দিল। লোকে বললে, ওর সেবার নাকি আয়ু ফিরে পেল। মৃগনয়নী জানে তা নয়। সেবা যে ও করেছে, বেশী করেছে কি কম করেছে সে খেয়ালই ওর ছিল না। দিনরাত্রি যে কি করে কেটেছে ওর ঠিক যেন স্মরণও নেই। একটা ঘোর ভাব ওকে ঘিরে রেখেছিল। ও যা করত তা যেন ভেতর থেকে কে একজন করাত। তারই তাগিদে ও যন্ত্রের মত কাজ করে গেছে। একটু কষ্ট হয়নি। একটু গর্বও হয়নি। ওর ভেতরের সব শক্তিটুকু যেন কেন্দ্রীভূত হয়ে এক অসাধারণ তাগিদের সৃষ্টি করেছিল মনের অবচেতনে। মনের চেতনায় তার ছিল মোহ আর আতংক। বাইরে তার প্রকাশকে চেপে দিল মাত্র। উদ্বিগ্ন হয়েছিল কিন্তু উদ্বিগ্নভাব দেখায়নি এক মুহূর্তের জন্যেও। এইটে সংযম ঠিকই। কিন্তু মনের তরঙ্গকে রোধ করবার শক্তি ওর ছিল না। মনের নিদারুন বেগের কাছে কতবার যে মানুষের হার হয়! তবু মনটাকে ঢেকে রাখবার এক চেষ্টা চলে অনবরত। আশ্চর্য শক্তি এই মনের। এর খবর কিছু কিছু জানে মৃগনয়নী। দৃষ্টিটা ছোটবেলা থেকেই ওর ভেতরের দিকেই বেশী। মনের ওঠানামা দেখতে ভারী মজা লাগে ওর। এটুকু ওর বাবার কাছ থেকে পাওয়া। ওর নিজের আর কিই বা সাধন। মৃগনয়নী মনে মনে হাসতে জানে। মনে মনে দেখতে জানে। ভাবতে জানে। এইটুকু মাত্র সম্পদ নিয়ে ও সংসারটায় ভেসে চলেছে। এখনও চলছে। কিছুটা ভাল হবার পর বনবিহারী বললো একদিন।—একটা কথা শুনবে? মৃগনয়নী তাকায়।

—বিশ্বাস করো ত' বলি।

—বলো।

—মন আর জীবনে ছোঁব না। মা আমাকে এই শিক্ষাই দিলেন।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে। বনবিহারী বলে।— আমার এ অসুখটার প্রয়োজন ছিল। মনে মনে মায়ের কাছে কাঁদতাম। মা বলত, ভালই হয়েছে। এরও প্রয়োজন ছিল। মৃগনয়নীর ভাল লাগে কথাটা শুনে। ও তা মনে প্রাণে জানে। সংসারে যা কিছু কষ্ট যা কিছু ভোগ তার পেছনে থাকে পরম মঙ্গল। জীবনে বার বার এর প্রমাণ পেয়েছে মৃগনয়নী। পর পর তাই প্রণাম করেছে পরম মঙ্গলময়কে আজ আরও একবার প্রণাম জানাল।

বাইশ

আট নটা বছর প্রায় কেটে গেল। মৃগনয়নীর জীবনে এ আট নবছর খুব মসৃণ। খুব সহজ। বনবিহারী মদ আর খায়নি। অতি সাধারণ এক চাকুরের মত সকাল সন্ধ্যা খেটে যা টাকা আনত, তাতে বেশ কেটে যেত। মৃগনয়নীরও বেশ কাটল। এ কবছর যেন একটা দীর্ঘ দিনের মত কেটেছে। আলোর অভাব ছিল না। অভাব ছিল না কিছু দেখবার। জীবনটা শুধু মাত্র একটা সুদীর্ঘ সাধনা। এর মর্ম মনে মনে বেশ অনুভব করেছে ও। এ সাধনা যে নিজের পূর্ণ হবার। নিজের সবটুকু নিজের দেখবার— এইটে বেশ বুঝতে পেরেছে এই নটা বছরে। ধীরে ধীরে তিলে তিলে নিজেকে ভরে নিয়েছে পূর্ণতায়। আস্বাদ পেয়েছে অনেক আনন্দের। বাইরের নয়। ভেতরের। তাই হয়ত বা বাইরের কোন মালিন্য এই সময়ে ওকে স্পর্শ করতে পারে নি।

ঘটনা যে কিছু ছিল না তা নয়। বছর দুয়ের পরেই একদিন সাড়ে তিনশ টাকা নিয়ে

ডাক্তারের বউ বীণার কাছে ওকে যেতে হয়েছিল। বলেছিল,— আমার গয়নাগুলো দাও ভাই। তোমার টাকা নাও।

—গয়না! সে ত' আমার কাছে নেই! সে ত' বেণে বউয়ের কাছে। তাছাড়া দুবছরে ও সুদ নেবে দশ টাকা। সাড়ে পাচশ টাকা নইলে ত' পাওয়া যাবে না। বীণার তেমনি ডাগর চোখদুটো বড়ই সুন্দর আর নিষ্পাপ মনে হোল।

—তবে কবে পাওয়া যাবে বেনে বউয়ের কাছ থেকে?

বীণা চোখদুটো তেমনি বড় বড় করেই বলে।— সে কথা ভাই আমি ঠিক করে বলতে পারছি না। বেণে বউ আবার বছর খানেক কেটে গেলে যদি সুদ না পায়, তবে গয়না দিতে চায়না। আপনি ত' সুদও দেননি। আর ক'বছর কিছু বলেনও নি।

—তবে কি হবে?

—আমি যাব একবার। দেখি যদি বার করতে পারি। তবে—।

বলে মৃগনয়নীর দিকে ডাগর সুন্দর চোখদুটো তুলে তাকিয়ে বলে।—তবে বোধহয় পাওয়া যাবে না। মৃগনয়নী শান্ত থাকতে পারে এমন কথা শুনেও। শুধু বলে,— না পাওয়া গেলে আর কি করা যাবে!

—পাওয়া যাবে।— বলে একটু নাটকীয় ভাবেই ডাক্তার ঘরে ঢোকে। কদাকার মুখখানা আরও কদাকার করে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে,— তুমি বোধহয় জানতে না আমি একটু আগেই ফিরেছি। আর পাশের ঘরেই ছিলাম। সব শুনেছি। বীণার সুন্দর মুখখানা একটু রাঙা হয়ে ওঠে। কালো মস্ত মুখখানা মৃগনয়নীর দিকে ফিরিয়ে বলে ডাক্তার।— গয়না আপনি পাবেন দিদি। গয়না আমাদের সিন্ধুকেই আছে।

—যদিনা থাকে! — বীণার স্বর কি মিষ্টি ঝাঁজালো।

—আছে। চাবি দাও। অনেককে এই রকম করে ঠকিয়েছ। এঁকে আর ঠকিও না। এঁর স্বামী-সেবা যদি দেখতে তবে পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে হোত তোমার। মৃগনয়নী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ডাক্তারের এই ধরণের কথায় যেন একটু সংকোচ বোধ করে। বীণা চাবির গোছাটা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সুন্দর কোমরটি দোলাতে দোলাতে। ডাক্তার সিন্দুক খোলে।

—দেখে নিন আপনার গয়না। এমন জিনিষ অনেক এভাবে ইনি জোগাড় করেছেন ত'!

মৃগনয়নী ডাক্তারের মুখের দিকে তাকায়। ধীরে ধীরে সিন্দুকের কাছে গিয়ে নিজের গয়নাগুলো বার করে নেয়। ডাক্তার হাতজোড় করে বলে।—একটা কথা ছিল। মৃগনয়নী তাকায়।

—আমার স্ত্রীকে আপনি ক্ষমা করবেন।

মৃগনয়নী একটু হাসতে পারে শুধু। ওই হাসিটুকুতেই যেন ওর সব সথা বলা হয়ে যায়। ডাক্তারের কালো অমসৃণ মস্ত মুখখানা পরম সুন্দর মনে হয়। আর বীণার ডাগর মিষ্টি চোখ দুটো? অবাক হয়ে ভাবে সৌন্দর্যটা সত্যি কি বাইরে। না, ভেতরে? এর পর থেকে এই প্রশ্নটাই বহুবার ওর মনে আনাগোনা করেছি। উত্তরটাও পেয়েছে অতি সহজে।

এমনিতরো কিছু ঘটনা যা জীবনেও ভোলা যায় না। নটা বছরে কত সংবাদ। চিঠি পাওয়া গেল দেশ থেকে।

শ্বাশুড়ীর জবানীতে।— তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। তুমি মাতাকে একবার দেখিতেও আস নাই। নতুন বধূমাতা কলিকাতা হইতে আমাদের খেদাইয়া দিয়াছে। দেশে চলিয়া আসিয়াছি। চোখে ভাল দেখিতে পাই না। অন্ধ মাতার দিকে তুমি না চাহিলে মরিয়া যাইব জানিবা।

ইতি আশীর্বাদিকা তোমার মাতাঠাকুরাণী। চিঠিটা আবেদন। মৃগনয়নী চিঠিখানা পেয়ে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। প্রমদাসুন্দরীও নিশ্চয়ই তার দেশে গেছে। নতুন বৌ এদেরও তাড়িয়েছে তাহলে! ও'রা তা' এখানেও আসতে পারতেন? এখানে এলে মৃগনয়নী সাধ্যমত তাদের সেবা করত। তাদের সঙ্গে বনাবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করত। আসবেই বা কি করে! কলকাতায় আসবার পর থেকে ছেলেকে ত একবার দেখতেও আসেনি। অসুখের সময়েও আসেনি। অসুখের সময় যে আসেনি, এইটেই সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে। বৃদ্ধা ত' তেমন মানুষ নন। মৃগনয়নীকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি কেন এলেন না। মৃগনয়নীর দৃঢ় বিশ্বাস নতুন বৌয়ের ভয়ে আর ছেলের ভয়ে আসতে পারেন নি। দুছেলের মাঝে পড়ে বুড়ীর কি কষ্ট। জন্মটা আমার কষ্টে দুঃখেই কাটল মা! দাওয়ার ওপরে বসে বুড়ীর সেই অন্তরের আক্ষেপটা আজও কানে বাজে। মৃগনয়নীর কষ্ট লাগে। সন্ধ্যায় বনবিহারী ফিরে সন্ধ্যা সেরে জলখাবার পর চিঠিখানা দেয়। ঠিক যা ভেবেছিল তাই। চিঠি পেয়ে বনবিহারী আগুন।

—এ ত আমি জানি। দাদা তাড়িয়েছে। নতুন বৌয়ের কথামত। আমি ত' অনেক আগে জানি। ধাঁর ভাবে বলে মৃগনয়নী,— আমায় ত' বলো নি?

—বলব আবার কি! এর আবার বলবার কি আছে শুনি? ওরা কি আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রেখেছে? একবার তা' আসতেও পারত আমার কাছে?

—ও'দের ওপর মিছিমিছি রাগ করছ। ও'দের কি দোষ? না আসতে দিলে আসবে কি করে শুনি?

—জোর করে আসবে। তুমি বাজে বক না।— রেগে যায় বনবিহারী।

—রাগ করছ কেন? মেয়েদের অবস্থা তুমি কি করে বুঝবে বলো?

—যাই বলো ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই।

—মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক কি উঠিয়ে দেয়া যায়!— মৃগনয়নী ঠাণ্ডা হয়ে বলে।

বনবিহারী মাদুরের ওপর শুয়ে পড়ে।

—আমার মনে হয়!

—কি?

মৃগনয়নী বনবিহারীর মাথায় পাতলা চুলের ভেতর আঙুল চালাতে চালাতে বলে,—বলছিলাম কি, ওদের কিছু কিছু টাকা মাসে মাসে দিতে হয়।

—এক পয়সাও দোব না।

মৃগনয়নী চুপ করে থাকে। বনবিহারীর পাতলা চুল লক্ষ্য করে বলে।—মাথায় কিন্তু টাক পড়ে গেল। বনবিহারী কথা বলে না। চুপ করে শুয়ে থাকে। বারান্দার শেষ প্রান্তে মাদুর পেতে পড়ছে কমল আর অমল। হারিকেনের আলোয় ঝুঁকে পড়ছে দুজন। দেখাচ্ছে বেশ। পড়ার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে।

—শোন?

—কি?

মৃগনয়নী বলে,— কালকেই কুড়িটা টাকা পাঠিয়ে দাও।

—যা খুসী করো। কমলকে দিয়ে পাঠাও। আমি পারব না।

বনবিহারীর হুকুমটা পেয়ে বেঁচে যায় মৃগনয়নী।

—ওদের বাড়ীর আর খবর জানো? এক অপিসে কাজ করো। নিশ্চয়ই কথা কাণে আসে।

—কানে আসে।

—আর কি খবর শুনলে?

—খবর তোমায় বলে লাভ কি? কালো বৌঠাকরুণকে তার দাদা নিয়ে গেছে।

বাপের বাড়ী চলে গেছে?

—হ্যাঁ।

—মনে পড়ে মৃগনয়নীর, একদিন দুপুরে, কালোবৌ তার কাছে এসে চিঠি লিখিয়েছিল। তার পরেই বোধহয় ভাই এসে নিয়ে গেছে। বেঁচেছে। তবু ভাইয়ের কাছে দুটো খেতে পারে। ভাই আবার কেমন কে জানে! তার একটা পেটত'। ছেলেপুলে নেই। কেটে যাবে কোনমতে।

—নতুনবৌ তাহলে একা।

—হ্যাঁ, চাকর ঠাকুর। তাছাড়া—।

—তাছাড়া কি?

—মাসে মাসে গয়না গড়াচ্ছে।

—এ খবর কোত্থেকে পেলে?—হাসে মৃগনয়নী।

—আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে পাঁচুবাবুকে গল্প বলে কিনা?

—তোমার সঙ্গে কথা বলে না?

—বলে, খুব কম।

মৃগনয়নী আর কথা বলে না?

মনে মনে একটা কথাই ভাবতে থাকে। কালই কমলকে দিয়ে কুড়িটা টাকা পাঠাতে হবে। বুড়ী শ্বাশুড়ীর জন্যে মনের কোথায় যেন ওর একটা বেদনা জাগে। ও মনে স্থির করে প্রত্যেক মাসেই টাকা পাঠাবে। আর বনবিহারীকে বলবার দরকার নেই।

এর পর থেকে এই কবছরই মাসে মাসে টাকা পাঠায় মৃগনয়নী। মাঝে মাঝে চিঠিও লেখে। নিজের নামেই লেখে। উত্তরও পায়। সাবিত্রী সমান হও। রাজরাণী হও। এমনিভাবেই কাটছে। মৃগনয়নী খুসী। বনবিহারীও যে খুসী নয় এমন কথা বলা যায় না। এক একবার তবু বলে—মাসে মাসে পাঠানর কি দরকার। দাদা ত' এক আধলাও দেয় না।

—তা হোক। মনে কর ও টাকাটা তুমি আমায় দিচ্ছ।

বনবিহারী হেসে ফেলে,—তোমার সঙ্গে পারবার জো নেই। আর কিছু বলোনি বনবিহারী।

বছর দুই আগে আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল। মর্মান্তিক। টেলিগ্রাম এসেছিল। বিকেলে। টেলিগ্রাম যে এত আকস্মিক আঘাত দিতে পারে আগে জানত না মৃগনয়নী। এরপর থেকেই টেলিগ্রামের কথা শুনলে ওর ভয় হয়। নিশ্চয়ই কোন খারাপ সংবাদ। কারণটা স্বাভাবিক। একটা কোন সুসংবাদের তার ও জীবনে পায়নি।

টেলিগ্রামটা পেয়ে ও বুঝতে পারেনি কিছু। ভবানীর মায়ের ঘরে গেল। ভবানীর বাবা ছিলেন। তাঁকে দিয়ে পড়াতে হোল। বললেন তিনি,—লিখেছে আপনারই নামে। বাবা মারা গেছে। চলে এসো। মৃগনয়নী কি বলবে কি করবে কিছু ভেবে পাচ্ছিল না। বাবা মারা গেছে। মাত্র তিনটি কথা। ভবানীর বাবার মুখের নির্বিকার উচ্চারণ। অথচ কথা তিনটি মাথায় সব ওলট পালট করে সর্বাংগ অবশ করে দিলো। কথার কি অমোঘ শক্তি! কাঁদতে পাচ্ছে না মৃগনয়নী। কান্না কাকে বলে ভুলে যাচ্ছে যেন। হাত বাড়িয়ে টেলিগ্রামটা নিতে গিয়ে বুঝল হাত কাঁপছে। দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখে দাঁড়াতে পাচ্ছে না। অগত্যা বসে থাকতে হোল

যতক্ষণ না কথা তিনটে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে মনের পরিধিতে, যতক্ষণ না গাল বেয়ে অনবরত চোখের জল পড়তে থাকে।

সন্ধ্যেবেলা বনবিহারী এসে সব শোনে। মৃগনয়নী কিছু বলতে পারে না। কমল বাপকে টেলিগ্রাম দেখায়। সব কথা বলে। বনবিহারী মৃগনয়নীর কাছে আসে। মৃগনয়নী শুয়ে পড়ে আছে। তখন থেকে আর ওঠবার মত সামর্থ নেই ওর।

—কিন্তু উঠতে ত' তোমায় হবে। আজকের ট্রেনেই চলে যাও বরঞ্চ। কমল যাবে সঙ্গে।

যাবার কথায় মৃগনয়নীকে উঠতে হয়। বনবিহারী আবার বলে,—আমি কালকের ট্রেনে যাব। টাকা নিয়েই যাব। মৃগনয়নী একটা বাক্স গুছিয়ে নেয়। বিছানা বেঁধে দেয় বনবিহারী।

—কত টাকা নেব বলত'?

—যা পার। চতুর্থীর কাজ করতে হবে ত' আমায়।

—শ ছয়েকে হবে।

—তা হবে।

ওরা প্রস্তুত হয়ে নেয়। বনবিহারী ওদের নিয়ে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসে।

বনবিহারী পরদিন সন্ধ্যায় প্রায় তিনশা টাকা ধার করে নিয়ে রওনা হয়। মনে মনে ঠিক করে বেশীদিন ওখানে মৃগনয়নীকে রাখা চলবে না। সে পাঁচদিনের ছুটি নিয়েছে। আসবার সময় ওদের নিয়ে আসবারই ইচ্ছে।

বহুকাল পরে বাপের বাড়ী এসে মৃগয়নীর একেবারেই ভাল লাগল না। এসে দেখল অনেক ব্যাপারই ও জানত না। মাঝে মাঝে কুশল সংবাদ দেয়া-নেয়া আর পুঁটিদির চিঠি এ ছাড়া আর কোন সংবাদ জানবার কথা নয়। ইদানীং পুঁটিদিও চিঠি দিত না আর। চিঠি দেবে কি করে। ও এসে পুঁটিদিকে যা দেখল, তাতে চিঠি দেবার মত অবস্থা তার নেই। ভোর থেকে বেলা দুটো তিনটে পর্যন্ত তার ঠাকুর ঘরেই কাটে। জপতপ পূজা সন্ধ্যায় কিযে আনন্দ ও পায় সংসারের আর কোনদিকে কিছু ভাববার বা দেখবার অবসর থাকে না। বেলা তিনটে সাড়ে তিনটেয় রান্নাঘরে গিয়ে যা হোক কিছু খেয়ে নেয়। খাওয়া দাওয়া তখন মিটে যায়, কাজেই নিজের হাতে সব নিয়ে খেতে হয়। একটু বিশ্রাম করে, একটু কথাবার্তা বলে সন্ধ্যায় চলে যায় ভাগবত পাঠ শুনতে। সেখান থেকে ফিরে আবার ঠাকুরঘরে। ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে কখন যে এসে শোয় সে খবর কেউ জানে না। রাত্রে খায় না কিছু। প্রথম প্রথম নাকি খুব রোগা হয়ে গিয়েছিল। এখন সয়ে গেছে। মুখখানির দিকে তাকিয়ে মৃগনয়নী অবাক হয়। যেন আনন্দ-মাখা মুখখানা। চাউনী কি শান্ত কি ঠাণ্ডা। ও যেন অনেক গভীরে বাস করছে যেখানে এরা কেউই নাগাল পাচ্ছে না। তবু মৃগনয়নী ওর সঙ্গেই কথা বলল বেশী। ওর কাছেই শুনল সব। রামতারণ পুরো জ্ঞান নিয়েই দেহত্যাগ করেছেন।

—কথা বলেছিলেন কিছু?—জিজ্ঞেস করলে মৃগনয়নী।

—আহা! কি সুন্দর ভাসাভাসা চোখদুটি আধবোঁজা করে বলতে লাগলেন, এ আমায় কোথায় আনলে, এ বুঝি পুরী। আর এখানে ও, এ তো গয়া! মধুর, মধুর, এত মধুর কথা কাকে বলি। পুঁটিদির মুখখানি বলতে বলতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

(ক্রমশঃ)

সুনীল সমারোহ

সন্তোষ দাস

মনের আকাশে আর মেঘ নেই
কী বর্ণাঢ্য নীলে —
আমার পৃথিবী আজ ঘাসের বনাত দিয়ে
কে মুড়িয়ে দিলে;
জানিনাতো কে সে —
চকিত বিদ্যুৎদাম হরিণী নয়না কেউ
হয়তো হবে সে।

কেটেছে কৈশোর দিন
যৌবনের যম যন্ত্রণাও
এখন সে ভারমুক্ত
আজ তাকে নাও বানা নাও
আর সে কাঙাল—
নয়, তাই শূন্যমনে
ছেড়ে দিয়ে হতাশার হাল
সে ভাবনাহীন —
জানেনা আকাশ আর
আঁকে কিনা রামধনু আলস্যে রঙীণ।

আজকে আকাশ
হঠাৎ ক্ষণিক পেল
মেঘের মিছিলে অবকাশ;
তাই তীব্র নীলে
আমার পৃথিবী আজ ঘাসের বনাত দিয়ে
কে মুড়িয়ে দিলে

নূপুর

কৃষ্ণ দাশ

সমুদ্র সরণি বেয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন দ্বীপ থেকে বহুদূর,—দূর,
দ্বীপ-দ্বীপপুঞ্জের অদূর বিদেশে যেন তোমার নূপুর
কতোকাল বাজে! কতোকাল হাল ধরে পাড়ি দিয়ে জলের ধূসর

মেলেনি এখনো; শুধু আলগোছে আলো মোছা রাত্রির এপার-ওপার
নূপুরের শব্দ শুনি এখনো পাইনি খুঁজে স্পষ্ট কিছু তার!

দিন গেলে সন্ধ্যে আসে কূলে ফেরে সমুদ্র পাখিরা,
আকাশ নির্জন হয়; জলের শরীরে জ্বলে ইন্দ্রনীল হীরা।
তখন স্বপ্নে পাই যন্ত্রণা, সন্দেহ অহরহ, কিছু সংশয়—

সিংহলি নীলার মতো সুনীল ভাবনা আর উতলা ব্যথার সঞ্চয় ॥
বিস্রস্ত অন্ধকারে হাল ধরে প্রতিক্ষণ অপগত জীবনের দিন
যখনি পেয়েছি কূল অন্যপারে নূপুরের শব্দ বিলীন ।।

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

ডাগ্যারম্যান, স্ফ্যাংকস্ এবং প্যাটারসন স্মিথ

আতলিয়েতে যে কজন ভাস্কর শিক্ষানবিশী করত ডাগ্যারম্যান কেবল তাদের একজন বল্লে তার প্রতি অবিচার করা হবে। আমাদের সমষ্টিকে সক্রিয় একটি কলকব্জার মত মনে করলে ডাগ্যারম্যানকে বলতে হবে যেন তার মেন্ স্প্রিং। সকালে সে না আসা পর্যন্ত সকলে মনে তটস্থ হয়ে থাকত এই পাগল কি অদ্ভুত, বিস্ময় কি বীভৎসের ঝাঁকা মাথায় বয়ে এনে হঠাৎ সেটা আমাদের মাঝে ফেলে দিয়ে সকলের ধরা বাঁধা কাজে একটা উলট পালটের ব্যবস্থা করবে। আতলিয়ের বাইরে তার আড্ডা ছিল বেশীর ভাগ সময় গানবাজনার সরগরমে ভরা কোন ক্যাফেতে বা সরাবখানায় কিংবা কুখ্যাত পল্লীর কোন দেহোপভোগের রঙ্গালয়ে। অনেক সময়ে তার সঙ্গে আসত ঐসব জায়গা থেকে তার পরিচিত দুএকটির সজীব স্মৃতি। দিনের কাজ শেষ হলে সে বলবে হয়ত চল হে "স্ফ্যাংক্স্"এ গিয়ে একটু ফূর্তি করে আসি। এই প্রস্তাবে আতলিয়ের ইংরেজ মহলে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সূত্রপাত হোত, যেন তাদের দেশ থেকে আনা মরালিটির ফানুষের কাচে ডাগ্যারম্যান একটা ইট ফেলেছে। পারীতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছোঁয়াচ পেতে যেমন আসে দলে দলে শিক্ষার্থী ও বিদগ্ধজন সারা জগত থেকে, তার বেশী আসে টুরিষ্ট, উন্মাদভোগের বিপণীভরা এই শহরে পঞ্চেন্দ্রিয়ের লালসাকে তৃপ্ত করতে। এই উদ্দেশ্য চরিতার্থের উপায় যদিও পৃথিবীর সর্বদেশের সহরে বিদ্যমান, সেগুলিকে অন্যত্র লোকদেখান মরালিটির খোলস ঢাকা দিয়ে, ছদ্মবেশে আড়ালে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। ফরাসীরা সেগুলিকে ভব্যভাবে সৌন্দর্যের বেশ শুরুমা চুমকি লাগিয়ে খোলাখুলিভাবে টুরিষ্টদের সামনে তুলে ধরেছে আর তারা সাময়িক সকল ইন্হিবিসান্মুক্ত হয়ে এই আদিম ইচ্ছা চরিতার্থের সুখসাগরে কয়েকটা ডুব দিয়ে নিচ্ছে। আবার দেশে ফিরে ইন্হিবিসান্-এর জেলখানায় ঢুকলে তাদের মনের চোরা মণিকোঠায় থেকে যাবে একটা সৌখিন অপরাধের স্মৃতি যাকে মনে মাঝে মাঝে স্মরণ করে পূর্বসুখের স্পর্শকে জাগিয়ে তোলার একটা আনন্দ পাবে।

মোপার্নাস পাড়ায় "স্ফ্যাংকস্" ছিল প্রাচীন মিশরীয় ভোগজীবনের একটা নকল পরিবেশ। একটি বড় বাড়ীর 'বেসমেণ্ট' অর্থাৎ জমির লেবেল-এর নীচে তৈরী তালায় ছিল এক বিরাট হলঘর যার মাঝখানে বসানো ছিল নারীমুখ ও সিংহদেহের একটি বিরাট স্ফিংক্স্ মূর্তি। থামগুলি মিশরীয় স্থাপত্যের ঢঙে গড়া ও নকশায় রাঙ্গান। পিরামিডের নীচের কামরাগুলিতে যেমন প্রাচীরচিত্র আছে তারই অনুকরণে এই হলের দেওয়ালে ছবি আঁকা। হলে পানকারীদের বসবার চেয়ার এবং টেবিলগুলিও প্রাচীন মিশরীয় আসবাব-এর ছাঁচে গড়া। পানীয় সরবরাহ করছে প্রাচীন মিশরীয় ক্রীতদাসীদের অনুকরণে স্বল্পমাত্র বাসপরিহিতা প্রায় উলঙ্গ সুন্দরী তরুণীরা। পানীয়ের দামের একটু বেশী পয়সা দিলে এরা ক্রেতাদের পাশে বসে বকসিসের মাপ অনুযায়ী আলাপ গল্প করবে আর তার চেয়ে গভীর আন্তরিকতার সুখ তাদের পরিবেশন করবার অনুরোধ জানালে তার উপযুক্ত মূল্য দিয়ে লিফ্টে উপরে উঠে প্রাচীন মিশরীয় আবহাওয়া ভরা ছোট ছোট কামরায় ক্রেতা এই ভাড়াকরা ক্রীতদাসীদের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য একলা হ'তে পারেন।

ডাগারম্যান স্ফ্যাংকস্‌-এ যাবার পয়সা কোন উপায়ে পেত জানিনা কারণ আমাদের আর তিনজনের মত তার পকেটে হাত দিলে খালি বাতাস ছাড়া মুঠোয় আর কিছু আসত না। সে কিন্তু স্ফাংকস্‌-এ যেতনা টুরিষ্টদের মত একটা কেনা আমোদের সুখান্বেষণে। কয়েকটি পুরুষ সঙ্গী দল নিয়ে সে বসত একটা টেবিল অধিকার করে এবং একটা করে কফি নিয়ে তারা সকলে অন্যদের রঙ্গলীলা দেখত কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে। প্রেম বেচাকেনায় নিরাসক্ত তাদের এই কড়া দৃষ্টি অন্যদের মনে আনত চাঞ্চল্য। সাধারণ সমাজনীতিতে হেয় এই সাময়িক লাম্পট্য ডাগারম্যান ও তার সঙ্গীদের চোখে ধরা পড়ায় টুরিষ্টরা যেন অপরাধী হয়ে পড়ত। যারা একটু আনন্দের খোঁজে এসেছে তাতে তারা যে দুর্বলতাই দেখাক ডাগারম্যানের কি লাভ হয় তাদের উদ্দেশ্যকে পণ্ড করবার চেষ্টায় তা জানতে চাইলে সে বলত "আমি তাদের কেবল জানিয়ে দিতে চাই যে যারা ওখানে যায় তারা সকলেই একই উদ্দেশ্যে আসেনা বা তাদের প্রবৃত্তি একই নয়। এরা এসেছে তো একটা স্বাভাবিক আদিম ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে তার জন্যে মরালি-টিকে বাঁচিয়ে চলবার এত ভড়ং কেন। জান একদিন এখানে বসে কফি খাচ্ছিলাম এমন সময় পানীয় সরবরাহকারিণী একটি মেয়ে এসে আমার পাশে বসে আলাপ করতে চাইলে তাকে বলে-ছিলাম যদি কোন নিগ্রো মেয়ে থাকে তো তাকে পাঠাও, তার সঙ্গে ঠিক স্বাভাবিক মানুষ হ'তে পারব। সে তখুনি "পাত্র"কে গিয়ে নালিশ করে যে আমি তার অপমান করেছি। "পাত্র" যখন মেয়েটিকে প্রত্যাখ্যান করার কারণ জিজ্ঞাসা করল বল্লাম এখানকার সাদা মেয়েদের আমার পছন্দ হয় না। এই উত্তরে সে ধরে নিল আমি সেক্স্‌ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক ধরনের লোক এবং বল্ল যে হোমোসেক্‌সিয়ালদের একটি বিখ্যাত ক্লাব আছে যেখানে না গিয়ে এখানে এসে স্বভাবনির্দিষ্ট লোকগুলির আনন্দের অন্তরায় হই কেন। তাকে বল্লাম "ম্যাঁসিয় একটা নকল মিশরীয় পরিবেশে অপ্রাকৃত মিশর-সুন্দরীর অলীক সংস্করণ ক্রেতাদের কাছে না বিতরণ করে সত্যিকারের প্রাচ্যদেশীয় সুন্দরীদের আমদানী করা উচিত। তা হলে এই মিথ্যা মায়ার বাজারে অন্তত খানিকটা হবে সত্যি। আমার বাইরেটা ভুল করে হয়েছে শ্বেতকায় সুইডিস, অন্তরে আসলে আমি আদিম প্রকৃতির তাই আমার চোখে প্রাচ্যদেশীয় কি আফ্রিকার কালো মেয়েকে সব চেয়ে সুন্দরী লাগে। এখানকার শ্বেতকায় মেয়েদের দিকে তাকালে মনে হয় এদের চামড়ার বাইরের এক পর্দাকে যেন ছিঁড়ে নিয়েছে আর তারা হয়ে গেছে যেন চলমান কাঁচা মাংসপিণ্ড।" এইসব লম্বাচওড়া কথা শুনে "পাত্র" নিজের মাথার খুলিতে স্ক্রুর পাঁচের মত আঙ্গুলের ভঙ্গি করে বল্লেন "ইল্‌ এ ফুঃ" অর্থাৎ আমার মাথার খুলিটি বেশ আল্‌গা যার ফাঁক দিয়ে প্রচুর বাতাস প্রবেশ করায় এই অভাগার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। কিন্তু জানহে শুধু আমি কেন সারা সুইডিস্‌ জাতটার মধ্যে দেখতে পাবে আমারই মত আদিম প্রবৃত্তির স্বতঃ-স্ফুরণের আবেগ যাকে সাদা চামড়ায় লেপ্টে থাকা সভ্যতার ভিনিয়ার কেবল চেপে রাখতে গিয়ে এনে দেয় একটা মানসিক অবসাদ। তাই আমোদ আমাদের ঠিক ভাল লাগেনা তাকে যে ভাবে পেতে চাই তা পাইনা বলে। আমরা খুঁজে বেড়াই বেখাপ্পা, বেরসিক কিছুর সন্ধানে যার সান্নিধ্যে দিনে অন্তত ঘণ্টা তিনেক অবসাদে খুসী হ'তে পারি। তোমাদের ভারতীয়দের কথা মনে করে আমি তোমায় হিংসে করি কারণ তোমাদের দেশে সেক্‌স্‌ সম্বন্ধে মনে হয় ভারতবাসী কোন ইন্‌হিবিসান্‌-এ পীড়িত নয়।" জিজ্ঞাসা করলাম সেক্‌স সম্বন্ধে আমরা ইনহিবিসান মুক্ত এ ধারণা তিনি পেলেন কোথা থেকে। সে বল্ল তোমাদের বহুবিবাহকে সামাজিকভাবে মেনে নেওয়া একটা প্রমাণ আর স্ত্রী ও পুরুষের দৈহিক সঙ্গম যে পাপ ও অপরাধ বা অশ্লীলতা নয় এবং এটা একটি প্রয়োজনীয় জৈবধর্ম এই সত্য ধারণার ছাপ দেখতে পাই তোমাদের মন্দিরের

ভাস্কর্যে রতিলীলায় উন্মত্ত নরনারীর মিলনমূর্তিতে। এই ভাস্কর্য থেকেই উদ্দীপনা পেয়ে রোদ্যাঁ প্রকৃতির এই অদ্ভুত লীলাকে দেখাবার চেষ্টা পেয়েছিলেন। কিন্তু ক্রিশ্চিয়ানিটির জারি করা অপরাধ ও অশ্লীলতার ভ্রান্ত নিষেধ যষ্টির প্রকোপকে তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কাজেই তাঁর করা অন্তরঙ্গ আলিঙ্গনবদ্ধ স্ত্রীপুরুষের যুগল মূর্তিগুলি যেন ঘোষণা করে যে তারা সাহস করে পাপ করছে এবং তাদের উপভোগের মাঝে একেবারে গাঢালা আনন্দের স্বচ্ছন্দ-চারিতা নেই যা ভারতীয় যুগ্মমূর্তিগুলিতে অনুভব করা যায়। বল্লাম বন্ধুবর মিউসিয়াম-এ ভারতীয় ভাস্কর্য দেখে ও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য পড়ে ধারণা করে ফেলেছে আমরা কেমন সেক্‌স ইন্‌হিবিসান্‌মুক্ত জাতি।

বর্তমানে আমরা কি ভাবে চলি ও আমাদের আচার, ব্যবহার ও প্রবৃত্তি কিরকম তার সঠিক বিচারে তুমি কিন্তু মহাভ্রমের ফাঁদে পড়ে যাবে। বহুবিবাহ থেকেও আমাদের দেশে দেহ বেচাকেনার রঙ্গালয় ছিল এবং এখনও আছে। ইউরোপ থেকে আমদানী করা ক্রিশ্চিয়ান ইন্‌-হিবিসান্‌ আমাদের মধ্যেও দেখতে পাবে প্রচুর এবং সে নিষেধের তীব্রতা তোমাদের দেশের থেকে আরো জোরাল যদিও সে ইন্‌হিবিসান্‌-এ অন্ধ সমাজ ভারতে ক্রিশ্চিয়ান নয় হিন্দু। স্বীকার করি এক সময়ে সেক্‌স্‌ সম্বন্ধে ধারণা ভারতে ইনহিবিসানমুক্ত ছিল যখন স্ত্রীপুরুষের দৈহিক মিলন অপরাধ বা অশ্লীলতা ছিল না কিন্তু তার অর্থ নয় যে তা ছিল অবাধ ও স্বেচ্ছা-চারিতায় ভরা। আমাদের দেশে এখনও স্ত্রীলোকদের উল্লেখ করা হয় "মায়ের জাত" বলে কিন্তু তার মধ্যে আগেকার সম্ভ্রমের আভাস নেই এখনও কথাপ্রসঙ্গে লোকে বলে তাদের ধর্ম-সঙ্গিনী কিন্তু বাস্তবে ধর্মে বা জীবনে তারা প্রকৃত সঙ্গিনীর অধিকার পায় না। ইসলাম আসায় ভারতের নারী সমাজে ঘরে বাইরে স্বচ্ছন্দ গতিবিধির অধিকার হারিয়ে বন্দী হল অন্তপুরে। ক্রিশ্চিয়ান ভাবধারা তাদের আবার বাইরে আসার দরজা খুলে দিতে সাহায্য করেছে কিন্তু যে সম্মান নিয়ে তারা অন্তঃপুরে প্রথমে গিয়েছিল আজ বেরিয়ে আসেনি সমাজের কাছে সেই সম্মানের দাবী অধিকার করে। সেক্‌স্‌-এর যে সুস্থ দৃষ্টি ছিল পূর্বের ভারতে তা আজ নেই। শিল্পী গড়েছিল এই অপূর্ব মিলনে আত্মহারা মূর্তিগুলি হাজার বছর আগে যে সমাজের জন্য তা আজ বদলে গিয়ে এর মধ্যে দেখে না শৃঙ্গারকে উপলক্ষ করে মূর্তির অপূর্ব ছন্দভঙ্গিমার সৌন্দর্য যা আত্মহারা প্রেমবিকাশই একমাত্র মূর্ত করতে পারে। এই মূর্তি-গুলির সামনে দাঁড়িয়ে যদি দর্শকের দৃষ্টি কেবল দেহের ক্রিয়াশীল ইন্দ্রিয় বিশেষ প্রতি আবদ্ধ না হয়ে যায় তা হলে সে দেখতে পাবে শৃঙ্গারের এই যোজনায় স্ত্রী ও পুরুষ সমান সমান অধিকার ও যোগ্যতা নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে জেণ্ডার হিসাবে মুখ্য ও গৌণের বিচার কোথাও দেখা যাবে না।

ভারত-সংস্কৃতির আজ বিকৃত বিচারে সেগুলিতে অশ্লীলতার চুণকালি পড়ে গেছে ক্রিশ্চিয়ান ইন্‌হিবিসান্‌-এর দৃষ্টি পেয়ে ভারতবাসী তার পূর্বপুরুষের এই অপূর্ব দানের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবে কেবল একটি কথা—জেণ্ডার ও তার ক্রিয়া এবং তা গোপনীয় ও অশ্লীল। তোমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতার এই দান মিশনারী ও সিনেমাসিঞ্চিত হয়ে আজ ভারতের অন্দরে বাইরে রমণীকে করেছে একটা অশ্লীল ইচ্ছা চরিতার্থের বিষয়বস্তু মাত্র।

তাকে বল্লাম "এই প্রসঙ্গে আমার এক বন্ধুর বলা একটি ঘটনা তোমায় বলি শোন। বেশ কয়েক বছর আগে পারীতে এসেছিলেন কলিকাতার কলেজের এক অতি গণ্যমান্য অধ্যক্ষ। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের একটি কর্ণধার যে সমাজ গড়ে উঠেছে প্রায় ক্রিশ্চিয়ানধর্মের কাঠামো অবলম্বন করে। বিগত বহু মনীষীদের আত্মা মাঝে মাঝে এই অধ্যক্ষ মহাশয়ের মাথায় ভর

করতেন। পারীতে থাকাকালীন একদিন ভোর ছ'টায় তারই প্রাক্তন এক ছাত্রের বাসায় উপস্থিত হয়ে তাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে বল্লেন "কাল রাত্রে আমার কাছে ভিক্তর য়্যুগো এসেছিলেন শিগ্গির নিয়ে চল আমাকে তাঁর বাড়ীতে। কোন যুক্তি বা অনুযোগ চলল না তাঁর সঙ্গে যেতে হল ছাত্রটিকে ভিক্তর য়্যুগোর বাড়ী, যদিও সেখানে তাঁদের অপেক্ষা করতে হোল দশটায় মিউ-সিয়াম খোলার সময় পর্যন্ত। য়্যুগোর বাসস্থানের সবকিছু দেখে তাঁরা যখন জুলিয়েত-এর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং অধ্যক্ষ মহাশয়কে বলা হলো যে এইখানে য়্যুগো তাঁর প্রণয়িনীর সঙ্গে সময় কাটাতেন, তিনি কাতরকণ্ঠে বলে উঠলেন "চল চল শিগ্গির এ ঘর থেকে বাইরে যাই। এই ঘরে য়্যুগোর দেহ কলুষিত হয়েছিল।" অধ্যক্ষ মহাশয় য়্যুগোর জীবনচরিত পড়েছিলেন কিনা জানা নেই এবং এও জানি না জুলিয়েত-এর য়্যুগোর প্রতি যে অনন্যচিন্ত পরিপূর্ণ প্রেম, যা তাঁর লোক ও ধর্মমতে বিবাহিত স্ত্রী দিতে পারেন নি, তাকে উপলব্ধি কর-বার মত মন ও হৃদয় এই অধ্যক্ষের ছিল না। য়্যুগোর শেষ জীবন পর্যন্ত বহু প্রণয়িনী সম্ভোগের তালিকা বেশ দীর্ঘ কিন্তু তার জন্য সমাজে তাঁর সুনামের হানি হয়নি কিন্তু যে রমণীর ভালবাসার একনিষ্ঠতা তাঁকে আমৃত্যু প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গিয়েছে তাকে তোমা-দের সমাজে খুব সম্মান না দিলেও অন্তত পাপের পর্যায়ে ফেলবে না। এঘটনা আমাদের দেশে হলে পরে য়্যুগো হয়ত কিছুটা পার পেয়ে যেতেন কিন্তু বেচারি জুলিয়েত-এর জন্য আমাদের সমাজ যে বিধান করত তাকে সহ্য করবার শক্তি তার হোত কিনা সন্দেহ। কে জানে হয়ত হাজার বছর আগে য়্যুগো ও জুলিয়েত-এর মত প্রেমিকদের ভারতীয় সমাজ শুধু সমাদর করেই ক্ষান্ত হোত না হয়ত তাদের যুগলমূর্তি পাথরে খোদাই করে মন্দিরে সাজাত।"

ডাগারম্যান বল্ল "আমাদের দেশে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মেয়েদের পরিপূর্ণ সম্মান ও আসন দেওয়া হয়েছে এবং বিবাহবাদে স্ত্রীপুরুষের দৈহিক মিলন সমাজে অবাধে চলছে কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় ভাস্কর্যের মত প্রেমলীলার ছবি এদেশীয় শিল্পীদের হাত থেকে আজও বের হয়নি কেন? বল্লাম ম্যঁসিয় তোমরা স্ত্রীপুরুষকে পাপ করার সমান অধিকার দিয়েছ কিন্তু মন থেকে দৈহিক মিলন যে পাপ নয় এ যতক্ষণ না সম্পূর্ণ দূরীভূত হচ্ছে—এমনকি মগ্নচৈতন্য মন থেকেও। গভীর প্রেমানুভূতির এই ছবিকে তোমরা দেখতে বা দেখাতে পারবে বলে মনে হয় না। আমায় কিন্তু ভুল বুঝনা যে স্ত্রীপুরুষের যথেচ্ছা মিলনকে আমি সমর্থন করছি। স্ত্রী ও পুরুষকে ধর্ম ও সমাজ জীবনযাত্রায় পরস্পর অংশীদারী হবার অধি-কার যে রীতিতে দিক না কেন তাতে যেন বজায় থাকে পরস্পরের প্রতি সম্মান ও আত্মস্ফুরণের মেনে নেওয়া পরিপূর্ণ সমান দাবী।

দৈহিকভাবে নিগ্রোদের প্রতি আকর্ষণ শুধু ডাগারম্যান নয়, শ্বেতকায় জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে এ দেখা যায়। একদিন সে এক লম্বা ও বলিষ্ঠ নিগ্রোকে আতলিয়ে দেখাতে নিয়ে এল। থ্রোনে দাঁড়ান উলঙ্গ মেয়েটির রূপাবলম্বনে আমরা মূর্তি গড়ছি দেখে নিগ্রো ভদ্রলোকটি বললেন "কি অদ্ভূত কি অদ্ভূত! শিল্পীরা এমনি করে মূর্তিগুলি গড়ে এ'ত আমার জানা ছিলনা।" তারপর জিজ্ঞাসা করলেন আমরা তাঁর মূর্তি ঐভাবে করতে ইচ্ছুক কিনা। আমরা জানালাম যে তাঁকে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়াতে হবে। এ শুনেই তিনি কাপড় খুলতে শুরু করে দিলেন। মেয়ে মডেলটি তাড়াতাড়ি থ্রোন থেকে নেমে কাপড় পরে তাঁকে মডেলের জায়গা ছেড়ে দিল। স্যুট ও অন্তরবাস ছেড়ে দাঁড়াল আমাদের সামনে যেন কালো ব্রঞ্জের এক এ্যাপোলো মূর্তি। পুরুষের এই বলিষ্ঠ সুঠাম মূর্তি একটু আগে আমাদের চোখে ভাসা

ভিনাস-এর রূপকে ম্লান করে দিল। আমরা নবউদ্যমে আরম্ভ করলাম তাঁর মূর্তি গড়তে। ভদ্রলোক তাঁর নাম পরিচয় দিলেন "স্মিথ্" বলে ডাগারম্যান-এর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল কোন এক পানশালায়। সপ্তাহ কয়েক পরে মূর্তিটির পরিসমাপ্তিতে ও মডেলের পারিশ্রমিক তাঁকে দেওয়া হলে তিনি বল্লেন "তোমরা একটু অপেক্ষা কর আমি এখুনি বাইরে হয়ে আসছি, তোমাদের সঙ্গে বিশেষ কথা আছে।" তিনি ফিরে এলেন একডজন শ্যাম্পেন-এর ভরা বোতল নিয়ে এবং সেগুলি প্রায় আমাদের হাতে ছুঁড়ে দিয়ে বল্লেন "পান কর আমোদ কর আমার শুভ সাফল্য কামনা কর।" জিজ্ঞাসা করলাম কিসের সাফল্য কামনায় আমরা পেলাম এতগুলি শ্যাম্পেন বা কিনতে তিনি তাঁর মডেলের পারিশ্রমিকের অন্তত ছগুণ ব্যয় করেছেন। তিনি বল্লেন "তোমরা দেখছি জান না যে আমি মুষ্টি যোদ্ধা প্যাটারসন্ স্মিথ্, আসছে কাল ফরাসী চ্যাম্পিয়ন-এর সঙ্গে আমার লড়াই হবে।" আমরা কাগজে এসংবাদ পড়েছিলাম ঠিক কিন্তু শুধু স্মিথ্ পরিচয় দেওয়ায় লক্ষ লক্ষ সাধারণ স্মিথ পদবীধারীদের মধ্যে তাঁর বিশেষ পরিচয় আমাদের মনে চাপা পড়েছিল।

মুষ্টিযোদ্ধা প্যাটারসন্ স্মিথ্ সারা জীবন বহু লড়াই করে প্রায় বিশ্ববিজয়ী মুষ্টি-যোদ্ধা হবার সম্ভাবনা পেয়েছিলেন কিন্তু সম্পূর্ণ সাফল্য তাঁকে কেবল পাশ কাটিয়ে গিয়েছে বহুবার। কয়েক বছর আগে হঠাৎ কাগজে দেখলাম সংবাদ, 'প্যাটারসন্ স্মিথ' প্রায় ভিখারী অবস্থায় নিউইয়র্কের কোন নিগ্রো পল্লীতে অতি দুঃস্থভাবে প্রাণত্যাগ করেছেন। কালো মিসমিসে ও শক্তিতে তরঙ্গায়িত পেশীভরা সেই সুঠাম দেহ আর ঘরকাঁপান প্রাণখোলা তাঁর হাসি আজও আমি ভুলিনি এবং কখনও ভুলব না।

'কবিরে খুঁজোনা তাঁহার জীবনচরিতে'

নিজের ব্যক্তিগত জীবন-ইতিহাস লিপিবদ্ধ করবার অস্বীকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করলেন সাহিত্য এবং সাহিত্য রচয়িতার যোগাযোগের প্রতি এক গূঢ় ইঙ্গিত দিয়ে। সাহিত্য-পাঠক এবং সমালোচককে বার বার বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তার মধ্যে একটি প্রধান সমস্যা এবং জিজ্ঞাসা হচ্ছে সাহিত্য এবং সাহিত্য রচয়িতার মধ্যে কী সংযোগ, তা আদৌ আছে কিনা, যদি থেকে তা কোথায় এবং তা কতোদূর গভীর, তাছাড়া সাহিত্য পাঠক এবং সমালোচকের তা নিয়ে মাথাব্যথার প্রয়োজনই বা কি?

শীর্ষোদ্ধৃত বাক্যে রবীন্দ্রনাথের যে সত্যোপলব্ধি তা তার নিজস্ব সাহিত্যদর্শন তথা জীবনদর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ ভেদে মনুষ্যত্বের দুই পৃথক সত্তার কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন এবং সাহিত্যকে অপ্রয়োজনের আনন্দ বলে মনে করেছেন। প্রয়োজনের স্রোতে নিত্যপ্রবাহিত যে জীবন মনুষ্যত্বের ক্ষুদ্র দিকটাই তাতে প্রকাশমান। কিন্তু সেখানেই মানুষ থামেনি। সে চলেছে অপ্রয়োজনের দিকে যেখানে দেখা দিয়েছে তার মহৎ পরিচয়ঃ সাহিত্য, শিল্প, সে বৃহৎ মানুষের সৃষ্টি। জীবনচরিত ধরে রাখে মানুষের নিত্য-দিনের ঘটনা, পরিচয়। তাই সেখানে জমে উঠে ঘটনার স্তূপ। পদ্মকে বৃন্তে পক্ষের সাহায্য পাবার আশা নেই, তার প্রয়োজনও নেই রবীন্দ্রনাথের মতে। পদ্মের পরিচয় তার পাঁপড়িতে, বর্ণে, গন্ধে। কবির পরিচয় তাঁর কাব্যের ভিতরেই স্পষ্ট, জীবনচরিতে নয়। তাই 'কবিকে খুঁজোনা তাঁহার জীবনচরিতে'। বস্তুভার-পীড়িত রবীন্দ্রনাথ একথা বলে ক্ষান্ত হলেও আমাদের সমস্যা থেকে যায়। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিতে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় শেক্‌স্‌পীয়রের জীবনকাহিনী চিরকালের জন্য রহস্যাবৃত হয়ে গেছে, কালিদাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়না, তাতে তাঁদের রচনার রসগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটেনি, তাঁদের কবিসত্ত্বার পরিচয় অজানা থাকেনি, কারণ সেই পরিচয় তাঁদের কাব্যই সার্থকভাবে বহন করছে।

কিন্তু তথাপি সমগ্র পাশ্চাত্য সমালোচনা সাহিত্য যে রীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে তার ভিতরে কবির জীবনচরিতকে একটি বিশেষ স্থান দেওয়া হয়, আর তারই প্রভাবে আমাদের দেশেও বর্তমান সমালোচকদের মধ্যে জীবনচরিতে কবিকে অন্বেষণ করবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাবে। এই প্রয়াসের ভিত্তি এবং সার্থকতা কোথায়?

প্রথমতঃ বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ মানুষের মধ্যে যে ভেদরেখা টেনেছেন তত্ত্ব হিসেবে তা সত্য হলেও বাস্তবে সেই ভেদরেখা সরল এবং স্পষ্ট নয়। মানুষের কোন কাজটা প্রয়োজনের, কোনটা অপ্রয়োজনের, কোনটা মানুষের মহৎ সত্তার পরিচয় কোনটা ক্ষুদ্র সত্তার তা এতোই অস্পষ্ট এবং জটিল যে তাদের মধ্যে ভেদরেখা টানা দুঃসাধ্য নয় অসাধ্য।

দ্বিতীয়তঃ মনোবিজ্ঞানের সূত্র ধরেও বলা যেতে পারে মানুষের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রয়োজনীয়

অপ্রয়োজনীয় ধ্যান-ধ্যারণা ভাবনা কল্পনা কোন কিছুই আকস্মিক নয়, নিগূঢ় কার্য-কারণ সূত্রে আবদ্ধ। খণ্ডিত এবং বিচ্ছিন্নভাবে যা আকস্মিক বলে মনে হয় অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে তার পেছনে আছে যুক্তিসঙ্গত ইতিহাস। জীবনে অনিবার্যতা এবং অবিসংবাদিতার স্থান নেই—সৃষ্টি, স্থিতি এবং ধ্বংসের প্রতি রহস্যময় এই বোধকে জাগ্রত রেখেই বলা চলে—সৃষ্টির রাজ্যে আমাদের বোধগম্য নয় বলেই অনিবার্যতাকে অস্বীকার করবার যুক্তি নেই।

যে জীবন প্রতি মুহূর্তের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠছে নানা পরিস্থিতি এবং ঘটনার টানাপোড়নে আমাদের ধ্যান ধারণা এবং কল্পনা তারই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সৃষ্টি। এই সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে বলতে বাধা নেই ক্ষুদ্র মানুষটিই সম্ভাবিত করে তুলে বৃহৎ মানুষটিকে। মৈত্রেয়ী এবং কাত্যায়নী দুই পৃথক সভাতার দুই পৃথক মনের দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা নয় একই সভাতার একই মনের একই সত্তার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত পরস্পর নির্ভরশীল দুটি স্তর বা অধ্যায়। মৈত্রেয়ী কাত্যায়নীরই পরিণতি। কাত্যায়নীকে বাদ দিয়ে মৈত্রেয়ী সম্ভব নয়।

যে কবিমন কাব্যের ভিতরে নিত্যনব সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত তা সম্পূর্ণ কারণ-নির্ভর। অকারণে মন অকস্মাৎ কবি হয়ে উঠেনা। কোন এক বিশেষ মুহূর্তে সবার দৃষ্টিপথে হয়তো একটি মন তার কবিত্বের সূচন-চিহ্ন নিয়ে এলো কোন একটি বিশেষ কবিতায়। কিন্তু দৃষ্টি-বহির্ভূত হলেও সূচনারও সূচনা আছে; রবীন্দ্রনাথেরই কথায় বলা যেতে পারে,—সন্ধ্যার প্রদীপের পেছনে ভোরবেলাকার সলতে পাকানোর মতো। প্রদীপ-শিখার সৌন্দর্য-ধ্যানে সলতের খবর না নিয়েও চলতে পারে। কিন্তু যখন মনে প্রশ্ন জাগে প্রদীপের শিখা কেন নক্ষত্রের মতো রাতভর জ্বলেলোনা, সে কেন আকাশের বিদ্যুতের মতো নিভে গেলনা, এককথায় প্রদীপত্ব সম্পর্কে সত্যাধারণার যখন প্রয়োজন তখন তার গঠন-প্রক্রিয়ার অর্থাৎ তেল সলতের খবর নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে শুধু মাত্র রচনার সৌন্দর্যধ্যানে তার গঠনপ্রক্রিয়ার জটিল এবং সূক্ষ্ম ইতিহাসের অনুধ্যান অপরিহার্য কিনা এই বিতর্কে প্রবেশ না করেও বলা চলে সৌন্দর্যেরও প্রকারভেদ আছে, এক কবির সৌন্দর্য জগৎ অন্য কবির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ সেই পার্থক্যে সচেতন বলেই তার বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে অনুধাবনযোগ্য মনে করে বিশ্লেষণ প্রয়াসী। তার মনে প্রশ্ন জাগে কোন বিশেষ কবির কাব্য-জগতের পরিবেশ কোন দিক দিয়ে কীভাবে এবং কী কারণে স্বতন্ত্র। কবি কেন একক। কেন মধুসূদনের হাতে রবীন্দ্রকাব্যগুলো রচিত হলোনা। এ প্রশ্নের সহজ জবাব রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন মধুসূদন—সম্পূর্ণ দুই পৃথক মানুষ জীবন সমুদ্রে দটি পৃথক দ্বীপের মতো, তাঁদের দৃষ্টি ভিন্ন, অনুভূতি স্বতন্ত্র, কাল আলাদা। প্রশ্ন উঠবে সেই দৃষ্টি এবং অনুভূতি পৃথক হবার কারণ কী, একই দেশের জলহাওয়ায়ই তো উভয়েই জন্মেছিলেন। সহজ জবাব একই জলহাওয়ায় জন্মালেও পৃথিবীকে উভয়ে দেখেছিলেন স্বতন্ত্র চোখে কারণ উভয়ের মন ছিল আলাদা, একই সূর্যের আলো নানা মেঘে নানা বর্ণে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। কিন্তু মন কেন পৃথক হয়, এই প্রশ্নের জবাব দিতে গেলেই জানতে হবে বিভিন্ন ঘটনা, পরিবেশ, তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিশিষ্ট সূক্ষ্ম ইতিহাস মনকে তিলে তিলে কীভাবে গড়ে তোলে। তাই বিভিন্ন কবির মন কোন দিক দিয়ে কেন স্বতন্ত্র হয়ে উঠে, একক রূপ দেয় তার যথার্থ অনু-সন্ধান সাহিত্য-পাঠকের অন্যতম প্রয়োজনীয় কাজ। আর সেই কারণে কবিকে অবশ্যই জীবনচরিতে খুজতে হয়।

তাছাড়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে রচয়িতা এবং রচনা যে আসল কথা নয়, রচয়িতা যে তার রচনা নামক যন্ত্রের সাহায্যে পাঠকের মনে সুর জাগিয়ে তোলেন, পাঠকের মনই যে আসল কথা

—একথা আন্তরিক ভাবে স্বীকার করে নিয়েও বলা চলে যে কবির জীবনচরিত সাহিত্য-পাঠকের পক্ষে অপরিহার্য। জীবনচরিতের আলো নিভিয়ে দিয়ে কবিকে কাব্যের অন্ধকারে অন্বেষণ করতে গেলে যুগ যুগ আগে যে কবি মর্ত্য থেকে বিদায় নিয়েছেন তার ভূত দেখা স্বাভাবিক। সময়ের ব্যবধানে বসে কাব্যের হাত বাড়িয়ে পাঠকের মনের তারে সুর জাগানো মোটেই সম্ভব নয়। পাঠকের মনের প্রস্তুতির প্রয়োজন। রচয়িতার সঙ্গে পাঠকের সাযুজ্য অপরিহার্য। কেননা "It is the function of the artist to create a situation through the magic of language, its order, its trailing history of allusions, dimly luminons, the rhythm and the metre, the arrangement, the sonorous effect and the imaginative shadows and the like such that the reader may, if his mind is in a suitable literary plane, interpret the linguistic or pictorial situation in such a manner as to give rise to his mind experiences more or less similar to that of the poet".

কবি তাঁর বিশেষ যুগে বসে তাঁর বিশিষ্ট জীবন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত যে বিশেষ ভাষা, ছন্দ, রূপকল্প রেখে গেছেন তার যথাযথ প্রতিক্রিয়া পাঠকের মনে ততোটুকু নিবিড় রসই সঞ্চার করবে যে পরিমাণে পাঠক দেশ কালের ব্যবধানকে অতিক্রম করে নিজস্ব সংবিৎকে কবি-সংবিতের সঙ্গে একাত্ম করে তুলতে পারবে যদিও একথা ঠিক যে পূর্ণ সংবিৎ-সাযুজ্য সম্পূর্ণ অসম্ভব। পাঠকের কবির সঙ্গে একাত্ম হবার প্রয়াসে কবির জীবনী প্রভূত সহায়তা করতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কবির জীবনচরিত কাব্যের রহস্যময় পরিবেশকে অনেক সময় বিস্ময়করভাবে আলোকিতও করে তুলতে পারে। যে কবি কাব্যে বর্ণচিত্রের সমাহারে দুর্বোধ্যপ্রায় জীবনচরিতে তাঁর অমার্বৃত রূপ প্রত্যক্ষ করে তাঁকে সহজভাবে বুঝতে পারা যায়। কবির জীবনচরিত কাব্যের দেশকালের উপর আলোকপাত করে কাব্যের ইঙ্গিতকেও স্পষ্ট করে তোলে।

যদিও সেই সঙ্গে একথাও সমানভাবে স্মরণীয় যে বাস্তব দেশ, কাল এবং জীবন থেকে আহৃত উপাদান কবি মনের স্পর্শে সম্পূর্ণ নতুন রূপগুণে বিবর্তিত হয়ে কাব্যের ক্ষেত্রে যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তার ব্যাখ্যা বাস্তব দেশ কাল এবং জীবন দিয়ে আর সম্পূর্ণভাবে করা যায়না। সৃষ্টি তার উৎসকে নিগূঢ় রহস্যে ঢেকে ফেলে পূর্বাহৃত উর্ধ্বতির মূল 'The ralidity of Critical approach' প্রবন্ধে স্বর্গত ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় এই সত্যটিকে একটি সুন্দর উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়েছেন — 'A cow may be fed with straw, hay, green leaves, mustard shells and the like, but a chemical enalysis of these materials will but help little to understand the value and the taste of the milk that it produces".

অমল চক্রবর্তী

স-মা জ স ম স্যা

গোড়ায় গলদ

প্রধানমন্ত্রী নেহরু সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষকদের আর্থিক দুরবস্থার কথা স্বীকার করেও বলেছেন যে এখনই তাদের বেতন বৃদ্ধি সম্ভব নয়, কারণ প্রাথমিক শিক্ষকেরা সংখ্যায় এত বেশী, এবং সরকারের ভাণ্ডারে অর্থের এতই অভাব, যে তাদের ক্লেশ উপশম করা সরকারের সাধ্যাতীত। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষকদের অন্ততঃ জীবনধারণোপযোগী বেতন দেওয়া (প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিভাগীয় সচিব শ্রী ডি, এম, সেনের স্বীকৃতি অনুযায়ী তাঁরা সরকারী দপ্তরের চাপরাশীদের থেকেও কম বেতন পান) কি সরকারের পক্ষে সত্যিই অসম্ভব ?

রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় সম্বন্ধে যারা ওয়াকিবহাল, তাঁরা জানেন যে আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষে কোন বিশেষ কাজে অর্থসংস্থানের সম্ভাব্যতা বা অসম্ভাব্যতা বহুলাংশে নির্ভর করে সরকারী ব্যয়ের বিকল্প ক্ষেত্রগুলির তুলনায় আলোচ্য ক্ষেত্রটির গুরুত্ব সম্বন্ধে সরকারী মনোভাবের ওপর। বিভিন্ন রাষ্ট্রে পরিকল্পনা ও ঘাটতি অর্থ সংস্থানের (ডেফিসিট ফিন্যান্সিং) পদ্ধতি স্বীকৃতি পাবার পর থেকে ক্রমেই দেখা যাচ্ছে যে সরকারী গুরুত্ব তালিকায় (প্রাইওরিটি লিষ্ট) উচ্চস্থানাধিকারী কাজগুলির অর্থসংস্থানের জন্য নিম্নস্থানাধিকারী কাজগুলির চলতি বরাদ্দ কমিয়ে, সরকারের আয় বাড়িয়ে বা প্রয়োজনমত ঘাটতি অর্থসংস্থানের সাহায্যেও টাকা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। সুতরাং কোন কাজের জন্য সরকারের তরফ থেকে যখন অর্থের অপ্রাচুর্যের কথা বলা হয়, তখন বুঝতে হবে যে অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় সরকারী দৃষ্টিতে তার গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম।

তাই এপ্রশ্ন সহজেই তোলা চলে যে, যে দেশে সাধারণ প্রশাসন খাতে বার্ষিক বরাদ্দ ১৯৪৮-৪৯ সালের তুলনায় সাড়ে পাঁচগুণ থেকে ছয় গুণ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে,[১] এবং যে দেশের সরকার বিদেশে নানা এলাকায় দূতাবাস বসাতে "সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল" পাঠাতে, এবং প্রতিবৎসর অসংখ্য রাষ্ট্রপ্রধানদের আমন্ত্রণের জন্য ক্রমবর্দ্ধমান হারে প্রচুর অর্থব্যয় করে চলেছেন, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষকদের গড়পড়তা বেতন-কে (সব মিলিয়ে সাধারণতঃ ৪০ টাকার মত) স্বিগুণ করে (সরকারী দপ্তরের চাপরাশিরা অনেকেই ৮০ টাকা বা ৯০ টাকা রোজগার করেন) তাঁদের ভরপেট খাওয়া ও ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতেই হঠাৎ এত টানাটানি পড়ে কেন ?

এর সহজ জবাব হচ্ছে বৈদেশিক দপ্তরের আয়তন বৃদ্ধি তো বটেই, এমন কি সরকারী ছোট বড় নানা অফিসে বিপুল চাপরাশিবাহিনী পোষণের গুরুত্বও আমাদের কর্তৃপক্ষের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে বর্তমানে শুধু পশ্চিম বাংলার সরকারী প্রশাসন দপ্তরগুলিতেই ৩৭,০০০ পিওন, চাপরাশি জাতীয় "চতুর্থ বর্গের কর্মচারী" আছেন। কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে উল্লেখিত হয়েছিল যে চতুর্থ বর্গের কর্মচারীসংখ্যা আর বাড়ান চলবে না। এরকম একটি সার্কুলার জারী হওয়ায় সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

কিন্তু এর পরেই প্রশ্ন উঠবে যে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে যখন দেশগঠনের জন্য এত প্রয়াস

চলছে, তখন সামাজিক, অর্থনৈতিক সর্ববিধ প্রগতির যা ভিত্তি—সেই শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি কেন এই অবহেলা?

এর জবাবে অনেক কিছু বলতে হয়। ভারতীয় কল্যাণরাষ্ট্রের প্রকৃতি, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠিগুলির শ্রেণীচরিত্র পুঁজিবাদী সমাজের মূল্যবোধের নক্সা (৩) ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ এবং মোটামুটিভাবে আলোচিত কারণগুলি ছাড়াও এর অন্ততঃ একটি মূল কারণ এখনও যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টিলাভে সক্ষম হয় নি। তা' হচ্ছে আমাদের তথাকথিত "আন্তর্জাতিক" মনোভাব।

আন্তর্জাতিকতা বা বিশ্বদৃষ্টি নিঃসন্দেহে মহৎ গুণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দীর্ঘদিনের দাসত্বজনিত হীনমন্যতার ফলে আন্তর্জাতিকতার যে অর্থ আমাদের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানসে প্রতিফলিত হয়েছে, তা সংক্ষেপে বিদেশে (মূলতঃ ইওরোপ ও আমেরিকায়) সামান্যতম স্বীকৃতির জন্য কাঙ্গালপনা এবং পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার অন্ধ অনুকরণ। মাটির রসে পরিপুষ্ট সংস্কৃতির স্বদেশে দাঁড়িয়ে, পাশ্চাত্য নবজাগৃতির শ্রেষ্ঠ অবদান অর্থাৎ বিচারাশ্রয়ী জীবনদৃষ্টি ও অলঙ্ঘনীয় মানব মর্য্যাদায় অবিচল বিশ্বাসকে গ্রহণ করে যে প্রকৃত আন্তর্জাতিকতা গড়ে উঠতে পারত, তার সাধনাকে আমরা বিগত দশ বছরে নিঃশেষে ধ্বংস করতে সফল হয়েছি। তাই দেশবাসীর বিপুলতম গরিষ্ঠাংশকে ক্ষুধা, কুশিক্ষা ও অজ্ঞানতার পঙ্কে নিমজ্জিত রেখে, দেশবাসীর ক্ষুধার অন্ন থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কপর্দক আমরা স্রোতের মত খরচ করে চলেছি বিদেশী রাষ্ট্রনায়ক ও সুযোগসন্ধানীদের প্রশংসাবাণী কেনবার আশায়। আর আমাদের তথাকথিত জনমতও আজ আন্তর্জাতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির স্বপ্নে এমনই মশগুল, যে জীবনযাত্রার মানের শোচনীয় অধোগতি এবং আভ্যান্তরীণ ব্যর্থতার হিমালয় পর্য্যন্ত আমাদের আত্মতৃপ্তির নিরেট গাঁথুনীতে ফাটল ধরাতে পারছে না।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও সেই বিকৃত আন্তর্জাতিকতার বিষময় প্রভাব পড়ছে। বিগত দশকে এদেশের পোষাক পরিচ্ছদ, আমোদ প্রমোদের প্রকৃতি, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন যারা নিরীক্ষণ করেছেন, তাদের কাছেই এ সত্য প্রতিভাত হয়েছে যে পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের শ্রেষ্ঠাংশ গ্রহণে অক্ষম হয়েও, আমরা দ্রুতগতিতে পাশ্চাত্যের বাহ্যিক জীবনযাত্রাপদ্ধতির অনুকরণে মত্ত হয়ে উঠেছি। এ প্রবণতার অখণ্ডনীয় প্রমাণ শুধু হলিউড সিনেমা ও রক্-এন্-রোলের অনুকরণ নয়। সে প্রমাণ গ্রীষ্মকালে এমন কি সামাজিক উৎসবে পর্য্যন্ত টাই-স্যুটের ক্রমবর্দ্ধমান ব্যবহার, সামান্য কারণে বা অকারণে পাশ্চাত্যগমনে ক্রমবর্দ্ধমান উৎসাহ[২] মিশনারী ও ফিরিঙ্গী স্কুল এবং তাদের নিকৃষ্টতম দেশী অনুকৃতিগুলির বর্দ্ধমান জনপ্রিয়তা এবং জাতীয় আন্দোলনের যুগে এদেশে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের যে সামাজিক মর্যাদাহানি ঘটেছিল, তার পুনরুদ্ধার। আজ আমাদের রাষ্ট্রনেতাদের মুখে ও জনপ্রিয় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশ্যেই ব্রিটীশসৃষ্ট সিভিল সার্ভিসের তথাকথিত কর্মদক্ষতার প্রশস্তি বিনাপ্রতিবাদে বিজ্ঞাপিত হয়। ফাইল সংরক্ষণ, দীর্ঘসূত্রতা, হৃদয়হীন ঔদ্ধত্য, বিবেচনাশক্তির অভাব ও নির্বোধ উন্নাসিকতা ছাড়া আর কোন ফসল আমাদের সরকারী দপ্তরে ফলে বলে দেশবাসীর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য না দিলেও, এদেশেরই জাতীয় ঐতিহ্যবাহী বিশিষ্ট সংবাদপত্রে জাতীয় সরকারের এক প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিরাট প্রবন্ধে আর্তনাদ করেন যে গত কয়েক বছরে আমাদের সিভিল সার্ভিসের উচ্চতম আধিকারিকদের বেতনবৃদ্ধি না ঘটায় তাদের জীবনযাত্রার মান বিপন্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে উল্লেখ করতে তার ভুল হয়ে যায় যে, যে দেশের মাথাপিছু আয় বার্ষিক ২৮১ টাকা (মাসিক ২৩ টাকা ৪১ নয়া পয়সা) সেই দেশে প্রবীণ রাষ্ট্রসেবকেরা মাসিক ১,৮০০ টাকা থেকে ৩,০০০ টাকা পর্য্যন্ত মূল বেতন ভোগ করলে[৪] তা' বর্তমান অবস্থাতেও কোন ক্রমেই সামান্য বলা চলে না।

সম্প্রতি আরও দেখা যাচ্ছে যে পশ্চিমদেশে সদ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত বিভিন্ন বৃত্তির স্নাতকেরা সরকারী বিভিন্ন বিভাগে তাঁদের যে প্রারম্ভিক মূলবেতন দিতে চাওয়া হয়, তাতে প্রচণ্ড অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রারম্ভিক মূলবেতন ২৫০্, ৩০০্ কিম্বা ৩৫০্ টাকা। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ভাতা ইত্যাদি সমেত ৩৫০, ৪৫০ কিম্বা ৪৫০ বা ততোধিক হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদেরও বক্তব্য সেই একই—অর্থাৎ, তাঁদের আকাঙ্খিত জীবনযাত্রার মান এতে রক্ষা করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে ঝানু সিভিলিয়ান গোষ্ঠি কিম্বা পাশ্চাত্য দ্বিজকুলের নব বটুবৃন্দ যে আয়কে নগণ্য বলে মনে করেন, এদেশীয় সুরুচি সম্মত জীবনযাত্রার পক্ষে তা' অপ্রচুর নয়। জীবনযাত্রার যে মানরক্ষার পক্ষে তা' অপ্রচুর, সেটি হচ্ছে উন্নাসিক ও সম্পদশালী ইংরেজ পরিবারের। আমাদের দরিদ্র দেশে উন্নয়নকালীন পর্য্যায়ে, নৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক কোন কারণেই সেই বিলাসবহুল জীবনযাত্রার মান কোন বিশেষ গোষ্ঠিকে উপভোগ করতে দেওয়া চলে না।[৫]

প্রকৃতপক্ষে সমস্যা অবশ্য বহুলাংশে দৃষ্টিভঙ্গী তথা মূল্য বোধ পরিবর্তনের। এবং আমাদের মনে হয় বিশেষতঃ এ জন্যই আজ এদেশে তথাকথিত "আন্তর্জাতিক" প্রবণতা কমা দরকার। রাষ্ট্রিয় স্তরেও যেমন বিদেশে প্রতিপত্তিলাভের আগ্রহ প্রশমন, তথা আভ্যান্তরীণ সমস্যা সমাধানে সর্বাধিক মনোযোগ আবশ্যক, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনেও দেশোপযোগী সুরুচিসম্মত অথচ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার মানকে জনপ্রিয় করে তোলা দরকার। পশ্চিমের দিকে মুখ না ফিরিয়েও এই শতাব্দীর গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ—জগদীশচন্দ্র—বিপিনচন্দ্রের নায়কত্বে তা' সম্ভব হয়েছিল।

ভারতীয় নবজাগৃতির সাধকদের সমন্বয়ী জীবনাদর্শের সেই প্রবাহ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাধনাই আমাদের আরও একবার আরম্ভ করতে হবে।

সুব্রতেশ ঘোষ

---

১) ১৯৪৮-৪৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ প্রশাসনখাতে ব্যয় হয়েছিল ৩৫ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। ১৯৫৭-৫৮ সালে সেই ব্যয় বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৯৪ কোটি ৭ লক্ষ টাকা; ১৯৫৮-৫৯ সালে এই খাতে বরাদ্দ হয়েছে ২০০ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা।

(২) ভারতে সমাজবাদের নামে যা গড়ে উঠছে, তা' প্রকৃতপক্ষে অবক্ষয়িত সামন্ততন্ত্রের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদের এক মিশ্রিত কাঠামো; সুতরাং এসমাজের মূল্যবোধ সমষ্টি মূলতঃ সামন্ততান্ত্রিক পুঁজিবাদী মূল্যবোধের সন্তান হবে, এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই।

(৩) বিদেশ ভ্রমণের সর্ববিধ সুফলে দৃঢ়বিশ্বাসী হয়েও, বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের পরিপ্রেক্ষিতে নিছক অর্থনৈতিক কারণেই উন্নয়কালীন পর্যায়ে কোন অনুন্নত দেশের অধিবাসীদের পক্ষেই অপরিহার্য্য কারণ ছাড়া বিদেশগমন অনুচিত বলে আমার মনে হয়।

(৪) প্রাক্তন মন্ত্রী মহোদয় যেসব বনেদী সিভিলিয়ানের জন্য অশ্রু বিসর্জন করেছেন, তারা সবাই আজ 'সিনিয়র সার্ভিস'-এর সিলেকসন্ গ্রেড-এর সুবিধে ভোগ করছেন। ওপরে যে মূল বেতন দেওয়া হল তা' নবসৃষ্ট আই, এ, এস আধিকারিকদের "নির্বাচনী বেতন হার।" ভাতাগুলি এর মধ্যে ধরা হয় নি।

(৫) সমাজের উচ্চতর গোষ্ঠিগুলির জীবনযাত্রার মানের বিপুল পার্থক্য কিভাবে অর্থনৈতিক প্রগতিকে ব্যহত করে, সে সম্বন্ধে ইতিপূর্বে "সমাজ সমস্যা" পর্যায়ে "বিলাসিতা প্রসঙ্গে" ও "অধিক উৎপাদন ও সুসম বণ্টন" প্রবন্ধ দুটিতে আলোচনা করা হয়েছে। "সমকালীনের" ফাল্গুন, ১৩৬৪ এবং শ্রাবণ, ১৩৬৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

স মা লো চ না

Declaration—Ed. by Tom Maschler, MacGibbon & Kee, London, 18s. 1957.

বৃটিশ জাণালিজমের অঘটনঘটনপটু মহিমায় যে লেখক গোষ্ঠী আজ 'ক্রুদ্ধ তরুণদল' নামে সমস্ত পৃথিবীতে পরিচিত, তাঁদের সম্বন্ধে সবপ্রথমেই লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে এঁরা সবাই খুবে একটা তরুণ নন এবং তার চেয়েও বড় কথা, নিজেদের ক্রোধী-পরিচিতিতে এঁদের প্রায় সবারই ভীষণ আপত্তি। দলসংহতিও এঁদের উপর আরোপ করা চলে না, কেননা এঁদের পারস্পরিক মতবৈষম্য মৌলিক এবং সেই হেতু গভীর। এইসব (এবং আরও অন্যান্য কারণে) বর্তমান বইটিকে ক্রুদ্ধ তরুণদলের ইস্তাহার বলে মনে করলে ভুল হবে।

মোট আর্টটি প্রবন্ধের সঙ্কলন এই বইটি। প্রবন্ধগুলির উপজীব্য বিভিন্ন। ডরিস লেসিংয়ের আক্ষেপ ঃ তিনি আধুনিক সাহিত্যে উনিশ শতকীয় সাহিত্যের উত্তাপ, দরদ আর মানবতাবোধ খুজে পান না। বৃটিশ থিয়েটারের সাম্প্রতিক অবনতি আর সিনেমাশিল্পের অধোগতির উৎসসন্ধানে লিপ্ত— এবং 'ক্ষিপ্ত'—হয়েছেন যথাক্রমে কেনেথ টাইনান ও লিন্ডসে অ্যান্ডারসন। সবচেয়ে বেসুরো শোনায় পিটার ওয়েনের লেখা। তাঁর মতে ১৯১৪ সালের পর থেকে পৃথিবী বিশেষ বদলায় নি এবং আমাদের সম্মুখে এখন কেবল সংগঠনের দায়িত্ব। এঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহ 'ক্রুদ্ধতম' লেখক Look- Back-in-Anger খ্যাত জন অসবোর্ণ। জিমি পোর্টার ও আর্চি রিসের স্রষ্টা অসবোর্ণ এখানে মুখর হয়েছেন—শালীনতার সীমা কিছুটা লঙ্ঘন করেই—টোরী ইংলণ্ডের সমাজব্যবস্থার ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নানা মূর্খতা ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে। ক্রোধনিদানের এই বৈচিত্র্য বিস্ময়কর, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল নয়। তাছাড়া, মোটামুটি একটা সুসম্বদ্ধ জীবনদর্শনের রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন কলিন উইলসন, বিল হপকিন্স ও স্টুয়ার্ট হলরয়েড।

আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আদর্শহীন অনীহামগ্ন পারিপার্শ্বিক সমাজ ও এর ভাবজীবনের অন্তঃসারশূন্যতা। পৃথিবীর ঘনায়মান সঙ্কট, যন্ত্র সভ্যতায় ব্যক্তির অসহায়তাবোধ, মানুষের মনের আশ্রয়হীনতা ও ক্লান্ত আত্মসমর্পণ—এইসবের বিরুদ্ধেই এঁদের বিক্ষোভ। সভ্যতার এই সঙ্কটে একটি চ্যালেঞ্জরূপ হচ্ছেন উইলসনের outsider— নীট্‌শের Superman বা ক্যামুর 'l'hommeabsurde'-এর সমগোত্রীয়। বিংশশতাব্দীর মানুষের মানসিক শূন্যতাবোধের পেছনে খুজে পাওয়া যাবে বস্তুবাদ আর যুক্তিবাদের জড়তা— এরই বিরুদ্ধে এই লেখকগোষ্ঠী অস্তধারণ করেছেন। লজিক্যাল পজিটিভিজমের শুষ্ক প্রভাব থেকে মানবদর্শনকে মুক্ত করতে হবে। সত্যিকারের দর্শন হবে এক ধরণের আধ্যাত্মিক অস্তিত্ববাদ — religious existentialism,, উইলসনের 'outsider-philosophy'। আর সাহিত্যই হবে এই দর্শনের ধারক এবং বাহক। সাহিত্যকে তার বন্ধ্যা নৈরাশ্যবোধের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, গভীর বিশ্বাসের উৎস থেকে সংগ্রহ-করা শক্তি নিয়ে মানুষের মধ্যে তুমুলভাবে জাগিয়ে তুলতে হবে আধ্যাত্মিক চেতনাবোধ। নূতনযুগের সাহিত্যিকের সামনে আজ এই বিরাট দায়িত্ব।

কথাগুলি শ্রুতিসুখকর, সন্দেহ নেই। মতপ্রকাশের বলিষ্ঠতাও প্রশংসনীয়। কিন্তু গুণীভাবে তলিয়ে দেখলে, স্পেণ্ডলার এবং টয়েনবী, ইলিয়ট এবং শ' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা এঁদের আধুনিকযুগের রোগ নির্ণয়ে বা প্রচারিত দর্শনে নূতন কিছু দেখতে না পেয়ে হতাশ হবেন। মাঝে মাঝে কেবল ইন্টেলেকচুয়াল অহমিকাটুকুই নূতন বলে মনে হয়। উইলসনের মানববাদ বিরোধী অহংবাদী দর্শন শতাব্দীর মোক্ষলাভের পথ সুগম করবে কিনা বিচার করে দেখা প্রয়োজন। অতীতের ধর্মান্ধ গোঁড়ামির ইতিহাস আর বর্তমানের বিলি গ্রাহামবাদের অভিজ্ঞতা যাঁদের মোহভঙ্গ করেছে তাঁরা এই নবীন অধ্যাত্মদর্শন গ্রহণে স্বভাবতই ইতস্তত করবেন। নানাবিধ ঝড়ঝঞ্ঝা আর বিশৃঙ্খলার কঠিন বর্তমানের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য এক ধরণের তুরীয় অধ্যাত্মবাদের আশ্রয় নেওয়া আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর কিনা তাও ভেবে দেখতে হবে। তবে, সভ্যতার যে সঙ্কট পৃথিবীর বিভিন্ন মনীষীকে বিচলিত করে এসেছে তার একটি সহজ সমাধান প্রদর্শনের সতৃপ্ত প্রয়াস কিঞ্চিৎ হাস্যকর হলেও, একথা অনস্বীকার্য যে ইংলণ্ডের এই তরুণ সাহিত্যিকগোষ্ঠীর আন্তরিকতা, উদ্যম ও বিদগ্ধ বিক্ষোভ সম্পূর্ণ বৃথা যাবে না। বইটিতে সেই সম্ভাবনারই কল্লোল শুনতে পাওয়া যায়।

প্রণবকুমার বর্ধন

Underdeveloped Areas L. W. Shannon (d.) Harper Brothers Publishers (New York) Price : $8.

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে এক নূতন পৃথিবীর অভ্যুদয় হয়েছে। সেই পৃথিবী হ'ল "অনুন্নত অঞ্চল"। শিল্পে অনগ্রসর, জনপ্রতি স্বল্প জাতীয় আয়, কৃষি-নির্ভর আদিম উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সীমাহীন দারিদ্রের সমাবেশ অনুন্নত অঞ্চলের প্রতিটি দেশেই দেখতে পাওয়া যাবে। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ পৃথিবীর কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নেই। পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চলের একটি সাধারণ নাম হল 'অনুন্নত অঞ্চল'। আবার পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ বাস করে এই দেশগুলিতে। প্রাগ্রসর ও অনগ্রসর দেশগুলির জাতীয়-আয়ের তুলনা করলে বোঝা যায়, কি পরিমাণ অসহনীয় অবস্থার মধ্যে এই সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগ বাস করলেও উত্তর আমেরিকা পৃথিবীর মোট জাতীয়-আয়ের শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগের অধিকারী। পক্ষান্তরে, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৫ ভাগ অধ্যুষিত এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার পৃথিবীর মোট জাতীয় আয়ে অবদান শতকরা ১৫ ভাগ মাত্র। রাজনৈতিক পরাধীনতাই অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে একমাত্র অন্তরায় নয়। শক্তিশালী প্রাগ্রসর দেশের অর্থনৈতিক আধিপত্য এবং ঐ সমস্ত দেশের সামাজিক ধ্যান-ধারণা ও পরিবেশ শিল্পোন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে লাতিন আমেরিকার অনেক দেশই স্বাধীন ছিল এবং মহাযুদ্ধের অবসানে এই বিস্তৃর্ণ অঞ্চলের এক বিরাট অংশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং বর্তমানে বহুদেশ স্বাধীনতার স্বারদেশে অপেক্ষা করছে। মহাযুদ্ধের মারফতে আমেরিকা ও রাশিয়ার দুই পরস্পর বিরোধী শক্তিজোটের নেতা হিসাবে আবির্ভাব ও মহাযুদ্ধের অবসানে এতগুলি দেশের স্বাধীনতালাভ আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং অর্থ-

নীতির ক্ষেত্রে নূতন নূতন জটিলতার সৃষ্টি করেছে। ১৯৪৯ সালে অনুন্নত অঞ্চলের জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের পরিকল্পনা এবং বৃদ্ধরাজনীতিতে ম্যালেনকভের আবির্ভাবে রাশিয়া কর্তৃক সামরিক ও আদর্শগত প্রতিযোগিতার বদলে অনুন্নত অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার অনুসরণ এই দেশগুলির গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে।

অনুন্নত অঞ্চলগুলির সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে বিগত কয়েক বৎসর যে পরিমাণে বই, প্রবন্ধ এবং রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে এবং বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, ইতিহাসে তার নজীর দুর্লভ। এই অজস্র রচনার সঙ্গে কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে পরিচিত হওয়া অসম্ভব। পাঠকের মনে কোন সংশয় সৃষ্টি না করে অনুন্নত অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করা বর্তমান পুস্তকের উদ্দেশ্য। পুস্তকটি কোন একজন ব্যক্তির রচনা নয়। একটি সঙ্কলন—অর্থনৈতিক সাহিত্যে যার নাম "রীডিং"। এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, গ্রন্থটির সম্পাদনের জন্যে অধ্যাপক শেনন ভাবীকালে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। গ্রন্থটি দশ বৎসরের অস্বাভাবিক পরিশ্রমের ফল। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরণের দুইশত পত্রিকার মোট দু'হাজার প্রবন্ধের মধ্যে তেত্রিশটি পত্রিকা থেকে ৪৬টি প্রবন্ধ এবং চারিটি রাষ্ট্রসঙ্ঘ কমিটির সারমর্ম বর্তমান গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। অনুন্নত দেশের সমস্যাগুলিকে অধ্যাপক শেনন, অনুন্নত অঞ্চলের সংজ্ঞা এবং পরিধি; রাজনৈতিক মর্যাদা, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য; জন-সংযোগের মাধ্যম ও শিক্ষা; শিল্পোন্নয়নের অর্থনৈতিক সমস্যা, অনুন্নত অঞ্চলের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এবং সমস্যা; অধিক উৎপাদন এবং উন্নয়নের পদ্ধতি; ব্যক্তিগত পরিচালনা বনাম রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প; অনুন্নত অঞ্চলে কারিগরী সাহায্য; অনুন্নত দেশে জনসংযোগ এবং শিক্ষা-বিস্তার প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা; জন্মহার ও নূতন স্বাস্থ্যব্যবস্থা; অনুন্নত দেশে সামাজিক-পরিবর্তন প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা; উন্নয়নের মাত্রা নিবারণের সমস্যা—এই তেরোটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সাধারণতঃ অতিকথনের দোষে দুষ্ট থাকে। এইজন্যে অধ্যাপক শেনন প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধই সংক্ষিপ্ত করেছেন। একই বক্তব্য একাধিক প্রবন্ধে যাতে স্থান না পায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের প্রারম্ভে সম্পাদকের ভূমিকা নিয়ে পুস্তকের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অধ্যাপক শেননেরই অবদান।

বইটি পড়তে ভাল লাগবে এই কারণে যে, প্রবন্ধগুলি একধরণে লেখা নয়। অনেকগুলি গবেষণামূলক প্রবন্ধ আবার অনেকগুলি সাংবাদিকতার ধরণে রচিত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নয়, সমাজ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে। এবং এই কারণে অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যে অনুন্নত দেশে উৎপাদন পদ্ধতি (টেক্‌নিক্‌) নিয়ে যে বিতর্ক চলেছে তার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ নেই। তবে অর্থনৈতিক প্রবন্ধ একেবারেই অনুপস্থিত। রাষ্ট্রসঙ্ঘ কমিটির রিপোর্ট ছাড়াও, প্যাটেল, অত্রে এবং বোরের প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের দেশে সেচকর বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে প্যাটেলের প্রবন্ধটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দরিদ্রদেশে অতিরিক্ত কর জনসাধারণ কখনও খুশী মনে গ্রহণ করে না। কোন সেচপরিকল্পনা কার্যকরী হলে যেহেতু একটি বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীরা উপকৃত হবে, সেইহেতু সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার ধরণে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের ব্যয়ের একটি অংশ বহনে বাধ্য করা উচিত। আবার সেচ ব্যবস্থার সুবিধা চাষীরা গ্রহণ করলে সেচকর না বসিয়ে, অধিক উৎপাদনের একটা অংশ ভাল বীজ, ধান, সার প্রভৃতিতে ব্যয়ে উৎসাহিত এবং রাজী করাতে পারলে উন্নয়নের গতি দ্রুত হওয়ারই সম্ভাবনা।

অনুন্নত দেশের উন্নয়নের জন্য শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হবে, যা অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে দুরূহ প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করবে। এই প্রসঙ্গে বিগ্‌লহোলের "অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনে সংস্কৃতির ভূমিকা" প্রবন্ধটি স্মরণীয়। ঔপনিবেশিক দেশগুলির বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি এবং শিল্পোন্নত সমাজের উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং শিল্পোন্নয়নে আগ্রহী দেশে বুদ্ধিজীবী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা বিভিন্ন প্রবন্ধে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। ঔপনিবেশে শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে আইভর জেনিংস্‌-এর রচনা পাঠকালে হাসি সংবরণ করা অসম্ভব। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ না দেওয়ায় শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনে গ্রামাঞ্চলে উৎসাহের সঞ্চারের বদলে অনেক সময়ে সামাজিক-বিরোধের জন্ম দিয়ে থাকে। সমষ্টি-উন্নয়ন কেন আমাদের দেশে সার্থক হতে পারে নি, কি ভাবে সার্থক হতে পারে, সে সম্পর্কে চতুর্থ অধ্যায়ে নিত্যানন্দ পটনায়ক্‌ এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রতিটি প্রবন্ধ, উন্নয়নে আগ্রহী প্রতিটি ব্যক্তির পড়া উচিত। এই প্রবন্ধগুলি থেকে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিযুক্ত ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক কর্মী ও নেতারা সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য পন্থার হদিস পাবেন।

অনুন্নত দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রশ্ন বর্তমান পুস্তকে স্থান পায়নি। ফলে পুস্তকের আকার বৃদ্ধি পায়নি ঠিকই কিন্তু পুস্তকের উদ্দেশ্য কিছু পরিমাণে ব্যর্থ হয়েছে—একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে জাপানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। চাষী কম জমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও একর প্রতি উৎপাদনের দিক থেকে জাপানের স্থান এশিয়াতে সম্ভবতঃ প্রথম। কি কি কারণে আমাদের প্রচলিত ধারণার বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয় তা' জানতে পাঠকের স্বভাবতঃই কৌতূহল জাগে। উন্নয়নের প্রকৃতি অনুযায়ী কর্মসংস্থানের স্তর সম্পর্কে কোলিন ক্লার্কের বক্তব্য নাকি স্বতঃসিদ্ধ। কলিকাতার কোন একটি বাংলা সাপ্তাহিকে একজন অর্থনৈতিক পণ্ডিত কোলিন ক্লার্কের বক্তব্যকে স্বতঃসিদ্ধ ধরেই আমাদের সামাজিক পরিবর্তন বিশ্লেষণে অগ্রণী হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বোয়ার এবং ইয়ামীর প্রবন্ধটি কোলিন ক্লার্কের চিন্তায়-অভ্যস্ত ব্যক্তিদের নূতন করে ভাবতে বাধ্য করবে। সম্পাদক মহাশয় অর্থনীতিকে সোজাসুজি সঙ্কলনে স্থান না দিতে চাইলেও প্রচুর সংখ্যা এবং ছক পাঠককে যুগপৎ আনন্দিত এবং বিমর্ষ করে। কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানগুলির যথার্থতা যাচাই করবার প্রয়োজন হয়। বেসরকারী পরিচালনা বনাম রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের অধ্যায়টি অনেককেই হতাশ করবে। চেষ্টা করলে এই বিষয়ে কি ভাল প্রবন্ধ সংগ্রহ করা যেত না! একথা উল্লেখ করবার বোধ হয় আর প্রয়োজন হবে না যে, সাধারণ আমেরিকান বইয়ের অতিকথনে ত্রুটি থেকে এই বইটি মুক্ত। অর্থনীতি এবং সমাজবিজ্ঞানে উৎসাহী নন, এমন ব্যক্তিও এই বই পাঠে উপকৃত হবেন।

নিরঞ্জন হালদার

বন্যা ও বন্যা ॥ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১২, ৩৲

গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে, বইয়ের নামটিও সহজবোধ্য নহে কাজেই বইখানি হাতে

পাইয়া অপণ্ডিত সমালোচকের ভাঁতি অস্বাভাবিক নহে। বইয়ের কয়েকপৃষ্ঠা পড়িয়া এই মানসিক অস্বস্তি অপসারিত হইতে বিলম্ব হয় না। গ্রন্থকারের ভাষায়—"যোগের ব্যান বায়ু হইতে বন্যার দমকা বায়ু ইহার সবই নির্বিচারে স্থান পাইয়াছে।" বস্তুতঃ পুস্তকখানি বৈঠকী ঢংএ (আজকালকার ভাষায় রম্য রচনা) লিখিত যৌলটি মনোরম লঘু প্রবন্ধের সমষ্টি, বিষয়-বস্তুর ক্রম ঃ—পাণ্ডা বিজ্ঞান, ব্যান ও বন্যা, আত্মাভিমান, আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়, পশু-পাখীর মনোধর্ম, দর্শন ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে, গ্রন্থজগতের দুই একটি কথা, মহাপুরুষদের মহাবিপদ, আমরা কি খাই, ভুজঙ্গধর ভট্ট, ভূতাচক্র, নব মানব, বাজার মাহাত্ম্য, শাদুর্লগিরির অরুণোদয়, রূপানুরাগ, লীলাখেলা। রম্য রচনায় যে ধরণের "ইয়ারকীর" ভাষা ব্যবহৃত হয় প্রবন্ধগুলিতে সে ভাষা ব্যবহৃত হয় নাই। পণ্ডিত, অপণ্ডিত উভয় জাতীয় পাঠকেরই এই বৈচিত্র্যময় প্রবন্ধগুলি সমানভাবে উপভোগ করিতে পারিবেন।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য সুখী পরিবার গঠন করা

নিপুণ গৃহস্থালি পরিবারের পক্ষে কল্যাণকর এবং জাতীয় অগ্রগতিতে সাহায্য করে।

- অপচয়, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের অপচয়, বন্ধ করুন।
- বাড়ীর পাশে সব্জীর বাগান করুন—এতে বাজারে ঘাটতি রোধে সাহায্য করা হবে।
- কেনার আনন্দেই জিনিসপত্র কিনবেন না।
- অবসর সময়ে সেলাই করুন বা বুনুন।
- সীমিত পরিবারই সুখী পরিবার।
- উপযুক্ত নাগরিক হতে হলে আপনার সন্তানদের শিক্ষার প্রয়োজন।
- যতটা পারেন অর্থ সঞ্চয় করে ভারত সরকারের স্বল্প সঞ্চয় পরিকল্পনায় তা লগ্নি করুন।

পরিকল্পনাকে সাহায্য করে নিজেকেই সাহায্য করুন